নিজে পড়ি

গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়

৮

কিছু কথা

মধ্যশিক্ষা স্তরে বাংলা ভাষা চর্চার বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রবেশ করবার সামর্থ্য যাতে শিক্ষার্থীরা অর্জন করতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে অষ্টম পাঠমালার বিষয়-সূচীতে বাংলা গদ্য ও পদ্যের প্রথম যুগের নমুনা থেকে শুরু করে সর্বাধুনিক কালের রচনাশৈলীর নিদর্শন পরিবেশিত হয়েছে।

বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্যের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচয় করিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে লেখক-লেখিকাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় যথাসম্ভব দেওয়া হয়েছে।

বিভিন্ন বিষয়ের গুরুত্ব, লঘুতা, মর্যাদাভেদে ভাষার রূপ ও শৈলীর মধ্যে যে বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়, তার সঙ্গে শিক্ষার্থীরা বিশেষভাবে পরিচিত হবে অষ্টম পাঠমালার বিভিন্ন বিষয়ক গদ্য ও পদ্যের সুপরিকল্পিত পরিবেশনার মাধ্যমে। বিষয়-ভেদে ভাষার যে ধরনের রূপ-ভেদ প্রচলিত আছে, তার প্রতি শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করলে তাদের পক্ষে এর তাৎপর্য উপলব্ধি করা সহজসাধ্য হবে।

প্রত্যেক গদ্য ও কবিতার শেষে যথেষ্ট পরিমাণে নমুনা-অনুশীলনী দেওয়া হয়েছে; যাঁরা পড়াবেন, তাঁরা আরও অনুশীলনী-প্রশ্ন গড়ে নিতে পারবেন।

পাঠক্রমে নির্ধারিত ব্যাকরণের কিছু আনুষঙ্গিক অনুশীলনীও বিষয়বস্তুর সামিল করা হয়েছে। এমনি আরও অনুশীলনী আছে 'নিজে লিখি নিজে পড়ি' অষ্টম অনুশীলনী গ্রন্থটিতে—যেটি এই পাঠমালাটির পরিপূরক ও সহায়ক পুস্তিকা।

পাঠ্যাংশগুলির প্রারম্ভে লেখক-জীবনটীকা সংগ্রহের কাজে ডঃ অশোককুমার কুণ্ডু মহাশয়ের সহযোগিতার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাই।

গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়

নিজে পড়ি

৮

অষ্টম পাঠ

গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়

ওরিয়েণ্ট লংম্যান

© ১৯৮৭ ওরিয়েণ্ট লংম্যান লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস
৫-৯-৪১/১ বশীর বাগ, হায়দ্রাবাদ ৫০০ ০২৯

অন্যান্য অফিস
কামানি মার্গ, ব্যালার্ড এস্টেট, বোম্বাই ৪০০ ০৩৮
১৭ চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, কলিকাতা ৭০০ ০৭২
১৬০ আন্না সালাই, মাদ্রাজ ৬০০ ০০২
১/২৪ আসফ আলী রোড, নয়াদিল্লী ১১০ ০০২
৮০/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, বাঙ্গালোর ৫৬০ ০০১
৫-৯-৪১/১ বশীর বাগ, হায়দ্রাবাদ ৫০০ ০২৯
জামাল রোড, পাটনা ৮০০ ০০১

ISBN O 86131 720 3

চিত্রশিল্পী : দেবাশিস দেব
প্রচ্ছদ : প্রবীর সেন

প্রথম প্রকাশ : ১৯৮৭

প্রকাশক :
ওরিয়েণ্ট লংম্যান লিমিটেড
১৭ চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ
কলিকাতা ৭০০ ০৭২

মুদ্রাকর :
জেনারেল প্রিণ্টার্স অ্যাণ্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১১৯ লেনিন সরণি, কলিকাতা ৭০০ ০১৩

Acc no - 15549

সূচীপত্র

জন্মবর্বর-কথা

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার

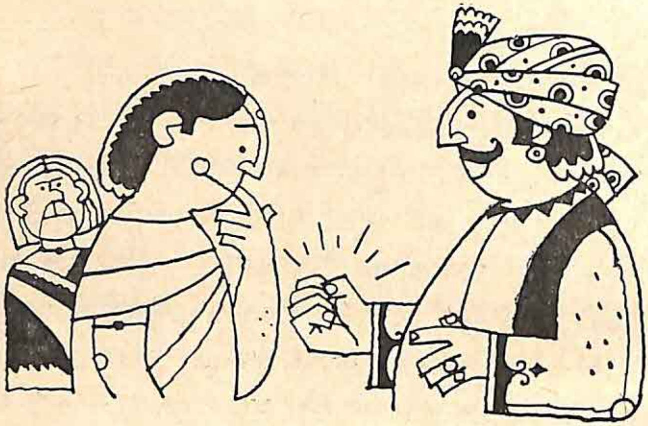
আদি নিবাস উড়িষ্যা। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে ইংরেজ কর্মচারীদের বাংলা শেখাতেন। অনেক বই লিখেছেন।

কৌশাম্বী নামে এক নগরী। তাহাতে দেবধর নামে এক গণক ছিলেন। শান্তিধর নামে তাঁহার এক পুত্র। সে জন্মবর্বর ছিল এবং পণ্ডিতের নিকট দীর্ঘকাল অধ্যয়ন করিল তথাপি তাহার বিষয়বোধ হইল না। প্রাজ্ঞরা সেই প্রকার কহিয়াছেন যে পিতা সন্তুষ্ট হইয়া পুত্রদিগকে সর্বস্ব দিতে পারেন কিন্তু ভাগ্য ও বুদ্ধি দিতে পারেন না। সেই পুত্র পিতার লোকদ্বয়সাধনের প্রত্যাশারূপ বৃক্ষের বীজ-স্বরূপ এবং সকলাভিলাষের স্থান সেই একমাত্র পুত্র। দেবধর সেই পুত্রের সহিত ছায়ার ন্যায় থাকিয়া অন্য সকল কার্যে বিরত হইয়া কেবল পুত্রকে শাস্ত্রাধ্যয়ন করাইলেন কিন্তু দীর্ঘকাল পর্যন্ত পিতার মহা যত্নেতে সেই পুত্র শুকপক্ষীর ন্যায় কেবল শাস্ত্রাভ্যাস করিল কিন্তু তাঁহার পদার্থবোধ হইল না।

দেবধর গণক পুত্রকে শাস্ত্রজ্ঞ করিয়া চিন্তা করিলেন যে এখন পুত্রকে রাজার নিকটে পরিচিত করিব। রাজা ঐ দুই জনকে দেখিয়া গণককে জিজ্ঞাসা করিলেন যে হে গণক তোমার পুত্র কোন্ কোন্ শাস্ত্র পড়িয়াছেন।

দেবধর নিবেদন করিলেন, হে ভূপাল আমার পুত্র জ্যোতিঃ-শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়াছে ইহাতে প্রশ্নের উত্তর করিতে পারে কিন্তু যদি আজি মহারাজ কোন প্রশ্ন করিলে তাহার উপযুক্ত উত্তর করিতে পারে তবে শাস্ত্রাধ্যয়নের ফলভাগী হইবে।

তদনন্তর রাজা কৌতুকাবিষ্ট হইয়া এক স্বর্ণাঙ্গুরী মুষ্টিমধ্যে রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন হে শান্তিধর গণক আমার মুষ্টিতে কি আছে কহিতে পার। পরে শান্তিধর খড়ি লইয়া গণনা করিল এবং গণনাতে জ্ঞাত হইয়া নিবেদন করিল হে নরেন্দ্র তোমার মুষ্টিমধ্যে কোন মূল কিম্বা কোন জীব নাহি কিন্তু ধাতুময় কোন দ্রব্য আছে।



রাজা কহিলেন যে তুমি যথার্থ কহিয়াছ। গণকপুত্র পুনর্বার গণনা করিয়া কহিল যে চক্রাকৃতি কোন দ্রব্য আছে। রাজা আজ্ঞা করিলেন যে বিশেষরূপে কহ। শান্তিধর পুনর্বার নিবেদন করিল যে মধ্যে শূন্য অথচ ভারী এমন দ্রব্য আছে।

রাজা সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন যে সাধু। গণকপুত্র রাজার প্রশংসা-বাক্যেতে স্ফুরিতবাহু হইয়া কহিতেছি কহিতেছি ইহা কহিয়া গণনা ত্যাগ করিয়া নিজ বুদ্ধিতে কহিল হে রাজন্ তোমার মুষ্টিমধ্যে পাথরের জাঁতা আছে।

রাজা এই কথা শুনিয়া কিছু হাস্য করিয়া কহিলেন হে দেবধর গণক তোমার পুত্র শাস্ত্রাভ্যাস করিয়াছে কিন্তু বুদ্ধিহীন।

অনুশীলনী

১। গল্পটি সংক্ষেপে চলিত ভাষায় লেখো।

২। অর্থ লেখো :

জন্মবর্বর, লোকদ্বয়, ভূপাল, অধ্যয়ন।

৩। সন্ধিবিচ্ছেদ করো :

সকলাভিলাষ, শাস্ত্রাধ্যয়ন, পুনর্বার, চক্রাকৃতি।

৪। সমাস ভেঙে লেখো :

বীজস্বরূপ, ফলভাগী, স্বর্ণাঙ্গুরী, মুষ্টিমধ্যে, স্ফুরিতবাহু।

৫। নিচের অংশটি চলিত ভাষায় লেখো :

'দেবধর গণক পুত্রকে শাস্ত্রজ্ঞ করিয়া চিন্তা করিলেন যে এখন পুত্রকে রাজার নিকটে পরিচিত করিব। রাজা ঐ দুই জনকে দেখিয়া গণককে জিজ্ঞাসা করিলেন যে হে গণক তোমার পুত্র কোন্ কোন্ শাস্ত্র পড়িয়াছেন।...'

লঙ্কাকাণ্ড থেকে

কৃত্তিবাস

(আনুমানিক ১৩৮৫ -   বঃ) ঃ জন্ম — ফুলিয়াগ্রাম, নদীয়া। বাংলা পদ্যে রামায়ণ রচনা করেন। বাল্যে চতুষ্পাঠীতে পাঠ শেষ ক'রে রাজ-সভায় পাঁচটি শ্লোক লিখে পাঠান। রাজা গৌড়েশ্বর তাঁকে রামায়ণ লিখতে বলেন।

এতেক মন্ত্রণা করি বিনতানন্দন।
পাখাতে করিল ঘর অদ্ভুত রচনা।
ভকতবৎসল রাম তাহার ভিতরে।
দাড়াইলা ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম রূপ ধরে॥
ধনুক ত্যজিয়া বাঁশী ধরিলেন করে।
হনুমান দেখে তবে ভাবিছে অন্তরে॥
হনু বলে প্রাণপণে করি প্রভু-হিত।
পক্ষীর সঙ্গেতে এত কিসের পীরিত॥
দেখিলেন হনুমান মহাযোগে বসি।
ধনু খসাইয়া পক্ষী করে দিল বাঁশী।
হনুমান বলে পক্ষী এত অহঙ্কার।
ধনু খসাইয়া বাঁশী দিল আরবার॥
যদি ভৃত্য হই মন থাকে শ্রীচরণে।
লইব ইহার শোধ তোর বিদ্যমানে॥

অনুশীলনী

১। কৃত্তিবাস সম্বন্ধে যা জানো সংক্ষেপে লেখো।

২। 'লইব ইহার শোধ তোর বিদ্যমানে'—কার কথা? কার সম্বন্ধে বলা হয়েছে? বলবার কারণ কী?

৩। বিনতানন্দন কে? তিনি কী করেছিলেন?

৪। অর্থ লেখো ঃ

এতেক, ত্রিভঙ্গ, ভঙ্গিম, ভৃত্য, বিদ্যমানে।

৫। চলিত গদ্যে কী হবে লেখো ঃ

এতেক, ভকতবৎসল, দাড়াইলা, ত্যজিয়া, পীরিত।

৬। কবিতাটির শেষ আট লাইন মুখস্থ লেখো।

একাদশী বৈরাগী

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(১৮৭৬-১৯৩৮): জন্ম—দেবানন্দপুর, হুগলী। পিতা মতিলাল। অর্থাভাবে কলেজের শিক্ষা সম্পূর্ণ করতে পারেননি। নানা দেশ ঘুরে, ব্রহ্মদেশে চাকুরি করেন। পরে বাংলায় উপন্যাস গল্প লিখে সমাজের সঙ্কীর্ণতার বিরুদ্ধে সকলকে সচেতন করেন।

কালীদহ গ্রামটা ব্রাহ্মণ-প্রধান স্থান। ইহার গোপাল মুখুয্যের ছেলে অপূর্ব ছেলেবেলা হইতেই ছেলেদের মোড়ল ছিল। এবার সে যখন বছর পাঁচ-ছয় কলিকাতার মেসে থাকিয়া অনার্স-সমেত বি. এ. পাশ করিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিল, তখন গ্রামের মধ্যে তাহার প্রসার-প্রতিপত্তির আর অবধি রহিল না। গ্রামের মধ্যে জীর্ণশীর্ণ একটা হাইস্কুল ছিল — তাহার সমবয়সীরা ইতিমধ্যেই ইহাতেই পাঠ সাঙ্গ করিয়া, সন্ধ্যাহ্নিক ছাড়িয়া দিয়া দশ-আনা ছ-আনা চুল ছাঁটিয়া বসিয়াছিল; কিন্তু কলিকাতা-প্রত্যাগত এই গ্রাজুয়েট ছোকরার মাথার চুল সমান করিয়া তাহারই মাঝখানে একখণ্ড নধর টিকির সংস্থান দেখিয়া শুধু ছোকরা কেন, তাহাদের বাবাদের পর্যন্ত বিস্ময়ে তাক লাগিয়া গেল।

শহরের সভা-সমিতিতে যোগ দিয়া, জ্ঞানী লোকদিগের বক্তৃতা শুনিয়া, অপূর্ব সনাতন হিন্দুদের অনেক নিগূঢ় রহস্যের মর্মোদ্ভেদ করিয়া দেশে গিয়াছিল। এখন সঙ্গীদের মধ্যে ইহাই মুক্তকণ্ঠে প্রচার করিতে লাগিল যে, এই হিন্দুধর্মের মত এমন সনাতন ধর্ম আর নাই; কারণ ইহার প্রত্যেক ব্যবস্থাই বিজ্ঞানসম্মত। টিকির বৈদ্যুতিক উপযোগিতা, দেহরক্ষা ব্যাপারে সন্ধ্যাহ্নিকের পরম

উপকারিতা, কাঁচকলা ভক্ষণের রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি বহুবিধ অপরিজ্ঞাত তত্ত্বের ব্যাখ্যা শুনিয়া গ্রামের ছেলে-বুড়ো নির্বিশেষে অভিভূত হইয়া গেল এবং তাহার ফল হইল এই যে, অনতিকাল মধ্যেই ছেলেদের টিকি হইতে আরম্ভ করিয়া সন্ধ্যাহ্নিক, একাদশী, পূর্ণিমা ও গঙ্গাস্নানের ঘটায় বাড়ির মেয়েরাও হার মানিল। হিন্দু-ধর্মের পুনরুদ্ধার, দেশোদ্ধার ইত্যাদির জল্পনা-কল্পনায় যুবক মহলে একেবারে হৈহৈ পড়িয়া গেল।

বুড়ারা বলিতে লাগিল, হঁ্যা, গোপাল মুখুয্যের বরাত বটে! মা কমলারও যেমন সুদৃষ্টি, সন্তান জন্মিয়াছেও তেমনি। না হইলে আজকালকার কালে এতগুলো ইংরাজী পাস করিয়াও এই বয়সে এমনি ধর্মে মতিগতি কয়টা দেখা যায়!

সুতরাং দেশের মধ্যে অপূর্ব একটা অপূর্ব বস্তু হইয়া উঠিল। তাহার হিন্দুধর্ম-প্রচারিণী, ধূমপান-নিবারণী ও দুর্নীতি-দলনী…এই তিন-তিনটা সভার আস্ফালনে গ্রামে চাষাভূষার দল পর্যন্ত সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল।

পাঁচকড়ি তেওর তাহার স্ত্রীকে প্রহার করিয়াছিল শুনিতে পাইয়া অপূর্ব সদলবলে উপস্থিত হইয়া পাঁচকড়িকে এমনি শাসিত করিয়া দিল যে পরদিন পাঁচকড়ির স্ত্রী স্বামী লইয়া বাপের বাড়ি পলাইয়া গেল।

ভগা কাওরা অনেক রাত্রিতে বিল হইতে মাছ ধরিয়া বাড়ি ফিরিবার পথে গাঁজার ঝোঁকে নাকি গান গাহিয়া যাইতেছিল। ব্রাহ্মণপাড়ার অবিনাশের কানে যাওয়ায়, সে তার নাক দিয়া রক্ত বাহির করিয়া তবে ছাড়িয়া দিল।

দুর্গা ডোমের চৌদ্দ-পনর বছরের ছেলে বিড়ি খাইয়া মাঠে যাইতেছিল; অপূর্বর দলের ছোকরার চোখে পড়ায়, সে তাহার পিঠের উপর সেই জ্বলন্ত বিড়ি চাপিয়া ধরিয়া ফোস্কা তুলিয়া দিল।

এমনি করিয়া অপূর্ব হিন্দুধর্ম-প্রচারিণী ও দুর্নীতি-দলনী সভা ভানুমতীর আমগাছের মত সদ্য সদ্যই ফুলে-ফলে কালীদহ গ্রামটাকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

এইবার গ্রামের মানসিক উন্নতির দিকে নজর দিতে গিয়া অপূর্বর চোখে পড়িল যে, স্কুলের লাইব্রেরীতে শশিভূষণের দেড়খানা মানচিত্র ও বঙ্কিমের আড়াইখানা উপন্যাস ব্যতীত আর কিছুই নাই। এই দীনতার জন্য সে হেডমাস্টারকে অশেষরূপে লাঞ্ছিত করিয়া অবশেষে নিজেই লাইব্রেরী গঠন করিতে কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া গেল। তাহার সভাপতিত্বে চাঁদার খাতা, আইন-কানুনের তালিকা এবং পুস্তকের লিস্ট তৈরী হইতে বিলম্ব হইল না।

এতদিন ছেলেদের ধর্মপ্রচারের উৎসাহ গ্রামের লোকেরা কোনমতে সহিয়াছিল। কিন্তু দুই-একদিনের মধ্যেই তাদের চাঁদা আদায়ের উৎসাহ গ্রামের ইতর-ভদ্র গৃহস্থের কাছে এমনি ভয়াবহ হইয়া উঠিল যে, খাতা-বগলে ছেলে দেখিলেই তাহারা বাড়ির দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া ফেলিতে লাগিল। বেশ দেখা গেল, গ্রামে ধর্মপ্রচার ও দুর্নীতি-দলনের রাস্তা যতখানি চওড়া পাওয়া গিয়াছিল, লাইব্রেরীর জন্য অর্থসংগ্রহের পথ তাহার শতাংশের একাংশও প্রশস্ত নয়। অপূর্ব কি করিবে ভাবিতেছে, এমন সময় হঠাৎ একটা ভারী সুরাহা চোখে পড়িল।

স্কুলের অদূরে একটা পরিত্যক্ত, পোড়ো ভিটার প্রতি একদিন অপূর্বর দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। শোনা গেল, ইহা একাদশী বৈরাগীর। অনুসন্ধান করিতে জানা গেল, লোকটা কি-একটা গর্হিত সামাজিক অপরাধ করায় গ্রামের ব্রাহ্মণেরা তাহার ধোপা, নাপিত, মুদী প্রভৃতি বন্ধ করিয়া বছর-দশেক পূর্বে উদ্বাস্তু করিয়া নির্বাসিত করিয়াছেন। এখন সে ক্রোশ-দুই উত্তরে বারুইপুর গ্রামে বাস করিতেছে। লোকটা নাকি টাকার কুমির; কিন্তু তাঁহার সাবেক নাম যে কি, তাহা কেহই

বলিতে পারে না — হাঁড়ি ফাটার ভয়ে বহুদিনের অব্যবহারে মানুষের স্মৃতি হইতে একেবারে লুপ্ত হইয়া গেছে। তদবধি এই একাদশী নামেই বৈরাগীমহাশয় সুপ্রসিদ্ধ।

অপূর্ব তাল ঠুকিয়া কহিল, টাকার কুমির! সামাজিক কদাচার! তবে ত এই ব্যাটাই লাইব্রেরীর অর্ধেক ভার বহন করিতে বাধ্য। না হইলে সেখানে ধোপা, নাপিত, মুদীও বন্ধ! বারুইপুরের জমিদার ত দিদির মামাশ্বশুর।

অনুশীলনী

১। অপূর্ব-র হিন্দুধর্মপ্রচারিণী, ধূমপান-নিবারণী ও দুর্নীতি-দলনী — এই তিনটি সভার আস্ফালনে গ্রামে চাষাভুষোর দল পর্যন্ত কেন সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল, তার বিবরণ দাও।

২। গ্রামে চাঁদা আদায়ের সমস্যার সুরাহা কিভাবে হল?

৩। অর্থ লেখো:

দশ আনা ছ আনা, তাক লাগিয়া গেল, ভানুমতীর আমগাছ, টাকার কুমির, ধোপা নাপিত মুদী বন্ধ।

৪। বাক্য রচনা করো:

মোড়ল, বরাত, কোমর বেঁধে লাগা, সুরাহা, গর্হিত।

৫। নিচের প্রত্যেকটি পদের কারক নির্ণয় করো:

‘এতদিন ছেলেদের ধর্মপ্রচারের উৎসাহ গ্রামের লোকেরা কোন-মতে সহিয়াছিল।’

৬। সমাস ভেঙে লেখো:

প্রসারপ্রতিপত্তি, ব্রাহ্মণপ্রধান, বিজ্ঞানসম্মত, দেশোদ্ধার, গঙ্গাস্নান।

সাপুড়ে

চণ্ডীদাস

(১৪১৭ - ১৪৭৭) : জন্ম — নান্নুর, বীরভূম। পিতা দুর্গাদাস বাগচি। বাশুলী দেবীর পূজক ছিলেন। সরল ভাষায় বৈষ্ণব কাব্য 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন" লেখেন।



বাদিয়ার বেশ ধরি,
বেড়ায় সে বাড়ী বাড়ী,
আইলেন ভানুর মহলে
খুলি হাঁড়ি ঢাকনি, বাহির করয়ে ফণী,
তুলিয়া লইল এক গলে ॥

বিষ হরি বলি দেয় কর।
শুনিয়া যতেক বালা,
দেখিতে আইল খেলা
খেলাইছে মাল পুরন্দর ॥

অনুশীলনী

১। 'বাদিয়ার বেশ ধরি, বেড়ায় সে বাড়ী বাড়ী'— কার কথা বলা হচ্ছে? তার সাপ খেলার দৃশ্য বর্ণনা করো।

২। কবিতাটি মুখস্থ লেখো।

৩। অর্থ লেখো :

বাদিয়া, ফণী, যতেক, বালা, মাল।

৪। চলিত গদ্যে কী হবে লেখো :

আইলেন, বাহির করয়ে, আইল, খেলাইছে।

৫। কবিতাটি কোন্ কাহিনী কাব্যের অংশ?

জাতক

ঈশানচন্দ্র ঘোষ

জাতক শব্দটি বৌদ্ধ সাহিত্যে বিশিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত। ইহাতে ভগবান গৌতম বুদ্ধের অতীত জন্মবৃত্তান্ত বুঝায়। বৌদ্ধেরা বলেন, শুদ্ধ এক জন্মের কর্ম্মফলে কেহই গৌতম প্রভৃতির ন্যায় অপার-বিভূতিসম্পন্ন সম্যক্‌সম্বুদ্ধ হইতে পারেন না; যিনি বুদ্ধ হইবেন, তাঁহাকে বোধিসত্ত্ব অর্থাৎ বুদ্ধাঙ্কুরবেশে কোটিকল্পকাল নানা যোনিতে জন্মজন্মান্তর পরিগ্রহপূর্ব্বক দানশীলাদি পারমিতার অনুষ্ঠান দ্বারা উত্তরোত্তর চরিত্রের উৎকর্ষসাধন করিতে হয়। পরিশেষে তিনি পূর্ণপ্রজ্ঞা লাভ করিয়া অভিসম্বুদ্ধ হন। অভিসম্বুদ্ধ অবস্থায় তাঁহার 'পূর্ব্বনিবাসজ্ঞান' জন্মে, অর্থাৎ তিনি স্বকীয় ও পরকীয় অতীত জন্ম-বৃত্তান্তসমূহ নখদর্পণে দেখিতে পান।

গৌতম বুদ্ধেরও এই অলৌকিক ক্ষমতা জন্মিয়াছিল। তিনি শিষ্যদিগের অধিকার-ভেদ বিবেচনাপূর্ব্বক ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ধর্ম্ম-দেশন করিতেন এবং অনেক সময়ে ভবান্তর-প্রতিচ্ছন্ন উপদেশমূলক অতীত কথা শুনাইয়া তাহাদিগকে নির্ব্বাণসমুদ্রের অভিমুখে লইয়া যাইতেন। গৌতমপ্রোক্ত জাতকগুলি বৌদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্রের নবাঙ্গের এক অঙ্গ এবং সুত্তপিটকান্তর্গত খুদ্দক নিকায়ের শাখা।

মূল জাতকগুলির প্রকৃত সংখ্যা কত তাহা নির্ণয় করা কঠিন। অধ্যাপক ফৌসবোল পালিভাষায় লিখিত 'জাতকত্থবণ্ণনা' নামক যে গ্রন্থের সম্পাদন করিয়াছেন, তাহাতে ৫৪৭টি জাতক আছে। কিন্তু সূক্ষ্মরূপে গণনা করিলে ইহাও প্রকৃত সংখ্যা নহে; কারণ, দেখা যায়, একই জাতক কোথাও ভিন্ন ভিন্ন নামে কোথাও কোথাও বা একই নামে পুনরুক্ত হইয়াছে।

অতএব বুঝা যাইতেছে যে, প্রকৃত জাতকের সংখ্যা, অর্থাৎ সে সকল আখ্যায়িকায় বোধিসত্ত্বের এক এক জন্মের কথা আছে, সেইগুলি গণনা করিলে জাতকত্থবণ্ণনার জাতকসংখ্যা ৫৪৭ অপেক্ষা কম হইবে।

কিন্তু জাতকত্থবণ্ণনার জাতকগুলিই সমগ্র জাতক নহে। এই গ্রন্থেই মহাগোবিন্দজাতক প্রভৃতি দুই একটি জাতকের নাম আছে, কিন্তু তাহাদের আখ্যায়িকাগুলি ইহার মধ্যে স্থান পায় নাই।

সুত্তপিটকে এবং শ্যাম ও তিব্বত দেশেও কয়েকটি স্বতন্ত্র জাতক প্রচলিত আছে। ফলতঃ 'জাতক' নামে অভিহিত আখ্যানগুলির কোন নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা নাই। যিনি যখন সুবিধা পাইয়াছেন, তিনি তখন প্রচলিত কোন কোন আখ্যানকে বৌদ্ধ বেশে সজ্জিত করিয়া এবং বোধিসত্ত্বকে তাহার নায়কের স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়া জাতক নামে চালাইয়া গিয়াছেন।

অনুশীলনী

১। 'জাতক' বলতে কী বোঝায় ?

২। জাতকের গল্পের সংখ্যা নির্ধারণ করা কেন শক্ত ?

৩। সন্ধিবিচ্ছেদ করো :

উত্তরোত্তর, নবাঙ্গ, পুনরুক্ত, প্রতিচ্ছন্ন, বুদ্ধাঙ্কুর।

৪। অর্থ লেখো :

পূর্ণপ্রজ্ঞা, স্বকীয়, অলৌকিক, স্বতন্ত্র, বোধিসত্ত্ব, নখদর্পণ।

৫। বিশেষ্যরূপ লেখো :

বিশিষ্ট, ভিন্ন, স্বতন্ত্র, প্রচলিত, প্রতিষ্ঠিত।

সংসার

গোবিন্দদাস

(১৫৩৭ — ১৬১২) : জন্ম - শ্রীখণ্ড, বর্ধমান। পিতা চিরঞ্জীব সেন। বাংলায় এবং সংস্কৃত ভাষায় বৈষ্ণব কবিতা লিখতেন।

নিদারুণ দারুণ সংসার।
শুনিয়া বৈষ্ণব মুখে
দেখিয়া কি পরতক্ষে
না ভজিনু হেন অবতার ।।
ও রসে না কৈলাম রতি
অভিমানে খালাম মতি
মরিলাম দারুণ বিষাদে।
আপনি ঈশ্বর হৈয়া
দৈন্যভাব প্রকাশিয়া,
রোদন করয়ে আর্ত্তনাদে ।।

অনুশীলনী

১। কবিতাটি মুখস্থ লেখো।

২। কবির খেদ কেন ? নিজের ভাষায় লেখো।

৩। চলিত গদ্যে কী হবে লেখো :
পরতক্ষে, ভজিনু, কৈলাম, হৈয়া, প্রকাশিয়া।

৪। বিশেষ্যের বিশেষণরূপ আর বিশেষণের বিশেষ্যরূপ লেখো :
বৈষ্ণব, দৈন্য, রতি, বিষাদ, ঈশ্বর।

বাঙালীর পরিচয়

দীনেশচন্দ্র সেন

(১৮৬৬ - ১৯৩৯) : জন্ম — কাজুরী, ঢাকা। পিতা ঈশ্বরচন্দ্র। শিক্ষকতা করতেন এবং 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' নামে বাংলাভাষার বিখ্যাত ইতিহাস-গ্রন্থটি লেখেন।

শতশত ডোমাচার্য ও হাড়ি জাতীয় তান্ত্রিক বৌদ্ধশ্রমণকে হিন্দুরা চূড়ান্ত শাস্তি দিয়া সমাজের অতি অধস্তন স্থানে নিপাতিত করিয়াছেন। মহত্তর বৃত্তিপ্রাপ্ত মেথরেরাও হয়ত বৌদ্ধ শ্রমণ ছিল। হিন্দু সমাজে চণ্ডালদের যে কাজ, তাহাই বৌদ্ধ তান্ত্রিকের জন্য নিয়োজিত হইয়া থাকিবে। কোন স্মৃতি বা শাস্ত্রানুশাসনে মেথর ও ডোম-হাড়ির নাম নাই ; ইঁহারা তান্ত্রিক ছিলেন এবং মলমূত্র ও মৃতদেহ লইয়া নানারূপ বীভৎস সাধনা করিতেন, তজ্জন্যই হয়ত এই শাস্তি।

অথচ এককালে যে ইঁহারা বৌদ্ধ মন্দিরের পুরোহিত ছিলেন, তাহার প্রমাণ আছে। হাড়ি সিদ্ধা গোপীচন্দ্র রাজার গুরু ছিলেন এবং এখনও ডোমেরা হারিতী দেবীর (শীতলা) পূজক এবং এখনও কোন কোন স্থানে ডোম ও হাড়িরা কালী পূজায় পৌরোহিত্য করিয়া থাকেন। বৌদ্ধ দোঁহা ও গানে ডোমাচার্যদের প্রাধান্যের প্রমাণ আছে।

ইহা ছাড়া হিন্দুরা বৌদ্ধ কীর্তি একেবারে লোপ করিবার জন্য যেখানে যেখানে তাঁহাদের প্রাচীন কীর্তি ছিল, তাহা মহাভারতোক্ত পঞ্চপাণ্ডব অথবা আর কোন হিন্দু রাজ-রাজড়ার সম্পর্কিত এইরূপ পরিকল্পনার দ্বারা বৌদ্ধাধিকারের চিহ্নমাত্র লোপ করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন।

এখনও অনেক মন্দিরে বুদ্ধ-বিগ্রহ বিষ্ণু-মূর্তিরূপে পূজিত হইয়া থাকে। আশ্চর্যের বিষয়, এই এতস্থানে বুদ্ধ বিগ্রহকে পুরোহিতেরা কালী বলিয়া প্রচার করিতেছেন। কাশীতে অক্ষয়-বটের নীচে সমাসীন বুদ্ধমূর্তিকে তিলভাণ্ডেশ্বরের পাণ্ডারা 'জটাশঙ্কর' বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন।

হিন্দুরা বৌদ্ধাধিকারের সমস্ত চিহ্ন ইতিহাস হইতে লুপ্ত করিয়াছিলেন। এমন কি, আমরা অশোক ও বিক্রমপুরবাসী দীপঙ্করের নাম পর্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছিলাম।

বাঙালার জনসাধারণ বলিতে কাহাদিগকে বুঝিতে হইবে? ইঁহারা জৈন নহেন, বৌদ্ধ নহেন, খৃস্টান নহেন, হিন্দু নহেন, মুসলমান নহেন — ইঁহারা বাঙালী। ইঁহাদের পূর্বপুরুষদের কত কীর্তি, বাঙালা ও বাঙালার বাহিরে ছাইয়া আছে; তাঁহার উত্তরাধিকারী সমস্ত বাঙালী জাতি, প্রধানত হিন্দু ও মুসলমান। যাহারা জগজ্জয়ী মসৃলিন নির্মাণ করিয়াছিলেন,—যাহা কেহ কেহ 'বুনট্ করা বাতাসের জাল', 'চলন্ত নদীর স্রোতঃ', 'পরীর স্বপ্ন', 'সাঁঝের নীহার,' 'অপ্সরা লীলা' প্রভৃতি নামকরণে পরিচিত করিয়াছেন, যাহা অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও জগতের বিস্ময়। সেই 'মসৃলিন'ই আমাদের পরিচয়।

নাম-পন্থী এবং সহজিয়ারা বঙ্গের জনসাধারণের গুরুস্থানীয়। পূর্ববঙ্গে ইহাদের সংখ্যা লক্ষ লক্ষ। ইহারা পরাভূত বৌদ্ধ শক্তির ধ্বংসাবশেষ; —বুদ্ধের জন্মোপলক্ষ্যে ইহারা চড়কোৎসব করে। এক মাসকাল গেরুয়া পরিয়া ও কাছা গলায় বাঁধিয়া অহিংস নীতি পালন করে এবং সন্ন্যাসী সাজে। তাহারা বেদ মানে না এবং গুরুর বাক্যে একান্ত প্রত্যয়শীল। ইহাদের উৎসবের নাম 'ধর্মের গাজন'। পরবর্তীকালে তাহা 'শিবের গাজন' নামে পরিচিত হইয়াছিল।

ইহাদের স্বাধীন মত ও সংস্কারবর্জিত উদারতা সুফী মতের

অনেকটা অনুকূল। ইহারা ভক্তি সাধনায় অনেকটা অগ্রসর ; ইহাদের সকলেই উচ্চ হিন্দুশ্রেণী কর্তৃক নির্যাতিত। তাহা ছাড়া ইহারা গুরুবাদী ও অলৌকিক শক্তিতে আস্থাবান। এই সকল কারণে সুফী সম্প্রদায় ইহাদের মধ্যেই প্রচার কার্য চালাইতে লাগিলেন। কিন্তু সেকালে প্রচার নীতি শুধু বর্জনমূলক ছিল না। তাঁহারা একদিকে বর্জন করিতেন এবং অন্যদিকে গ্রহণ করিতেন। এর সদ্ধর্মীরা ব্রাহ্মণের উৎপীড়নে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িতেছিল ; ইস্‌লামের সামাজিক উদারতা ও সাম্য ইহাদিগকে বিশেষ করিয়া আকর্ষণ করিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে বহু সংখ্যক নরনারী ইস্‌লামের ভুজাশ্রয়ে আসিয়া শান্তি লাভ করিল।

বঙ্গের এক বৃহৎ জনসাধারণ গোঁড়া হিন্দু সমাজের দ্বারা উপেক্ষিত হইয়া সেই কঠোর গণ্ডীর বাহিরে যে সাধনা করিতেছিল, ইস্‌লাম গ্রহণ করিয়া তাহারা তাহা ছাড়ে নাই। সুফী গুরুগণ তাহাদিগকে আবার অনেক নূতন তত্ত্ব শিখাইয়াছিলেন এবং তাহারাও ইস্‌লামকে এদেশের উপযোগী করিয়া নূতন গড়ন দিতে ছাড়ে নাই।

এই লেন-দেনের কারবারে সুফীমত বঙ্গদেশে এক অপরূপ ভাবে পুষ্টি লাভ করিয়াছিল। ইহাতে গোঁড়া সম্প্রদায়ের বিরক্ত হওয়ার কোন কারণই নাই। যাঁহারা শত সহস্র বৎসরের সংস্কৃতি লইয়া মুসলমান হইয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাদের পূর্বপুরুষের অবদান বিস্মৃত হইবেন কিরূপে ? সুফীরা মুসলমান হইয়াও বৌদ্ধ ধর্মের কোমল অংশ ও দেহতত্ত্ব ছাড়িতে পারে নাই। সেই কোমলতায় হাফেজ ও সাদীর অপূর্ব আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ ইঙ্গিত রূপকের কবিতায় ফুটিয়া উঠিয়াছে।

অনুশীলনী

১। হিন্দু সমাজের তলায় কারা? কেন তাদের অধঃপতিত করা হয়েছিল?

২। লেখক যা বলেছেন 'পরাভূত বৌদ্ধ শক্তির ধ্বংসাবশেষ', বাঙালী সমাজে তার কী কী নিদর্শন মেলে?

৩। বিশেষণরূপ লেখো :

পৌরোহিত্য, প্রাধান্য, আকর্ষণ, বর্জন, তত্ত্ব, লোপ।

৪। সমাস ভেঙে লেখো :

শাস্ত্রানুশাসন, মলমূত্র, ডোমাচার্য, সদ্ধর্মী, দেহতত্ত্ব।

৫। সন্ধিবিচ্ছেদ করো :

মহাভারতোক্ত, সমাসীন, উত্তরাধিকারী, জন্মোপলক্ষ্যে।

অন্নদামঙ্গল

ভারতচন্দ্র রায়

(আনু. ১১১৯-১১৭৬ বঃ) : জন্ম—পাণ্ডুয়া, বর্ধমান। দারিদ্র্যের মধ্যেও চোদ্দ বছর বয়সে সংস্কৃত ব্যাকরণ ও অভিধান আয়ত্ত করেন, পারসী ভাষা শেখেন। কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের বৃত্তি পেয়ে 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য লেখেন এবং 'রায়গুণাকর' উপাধি পান।

আয় রে কন্দল তোরে ডাকে সদাশিব।
মেয়েগুলা মাথা কোড়ে তোরে রক্ত দিব ॥
বেনা ঝোড়ে ঝুটি বান্ধি কি কর বসিয়া।
এয়ো সুয়া এক ঠাঁই দেখ রে আসিয়া ॥
ঘুরুলে বাতাস লয়ে জলের ঘুরলে।
সেহাকুল কাঁটা হাতে ঝাট এস চলে ॥
এক ঠাঁই এত মেয়ে দেখা নাই যায়।
দোহাই চণ্ডীর তোরে আয় আয় আয় ॥
নারদের মন্ত্রতন্ত্র না হয় নিষ্ফল।
পরস্পর এয়োগণে বাজিল কন্দল ॥

অনুশীলনী

১। ভারতচন্দ্র কে ছিলেন? তাঁর কী উপাধি ছিল?

২। অর্থ লেখো :

এয়ো, সুয়া, ঠাঁই, ঘুরুলে বাতাস, ঝাট এস চলে।

৩। চলিত গদ্যে কী হবে লেখো :

কন্দল, মাথা কোড়ে, ঝুটি বান্ধি, সেহাকুল কাঁটা।

৪। 'নারদের মন্ত্রতন্ত্র না হয় নিষ্ফল'—এ কথা বলার মানে কী?

নতুন কথামালা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১৮৬১ - ১৯৪১) : জন্ম — জোড়াসাঁকো, কলকাতা। পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। সুন্দর কবিতা লিখে 'নোবেল পুরস্কার' পান। গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নাটক অনেক লিখেছেন। 'বিশ্বকবি' রূপে বন্দিত হন। 'বিশ্বভারতী' বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন শান্তিনিকেতনে।

একদা কয়েক জন কাঠুরিয়া এক পার্বত্য সরল বৃক্ষের শাখাচ্ছেদনে মনোযোগী হইয়াছিল। শ্রমলাঘব করিবার অভিপ্রায়ে বিস্তর পরামর্শপূর্বক তাহারা এক নূতন কৌশল অবলম্বন করিল। যে শাখা ছেদনের আবশ্যক, কয়েক জনে মিলিয়া তাহারই উপর চড়িয়া বসিল এবং নিভৃতে বসিয়া সতর্কতার সহিত অস্ত্রচালনা করিতে লাগিল।

যথাসময়ে শাখা ছিন্ন হইয়া পড়িল, এবং কাঠুরিয়া কয়েকটিও তৎসঙ্গে ভূতলে পড়িয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।

কাঠুরিয়ার সর্দার এই সংবাদশ্রবণে অধীর হইয়া সেই তরুসমীপে উপস্থিত হইল এবং কুঠার আস্ফালন করিয়া কহিল, 'তুমি যে অপরাধ করিয়াছ আমি তাহার বিচার করিতে চাহি।'

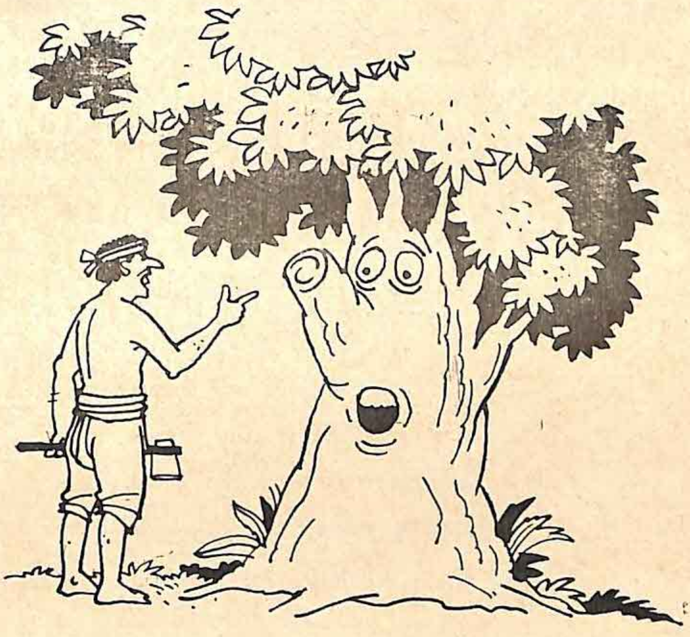
বনস্পতি সাতিশয় বিস্মিত হইয়া কহিল, 'হে জনপুঙ্গব, আমার স্কন্ধের উপর আরোহণ করিয়া আমারই শাখাচ্ছেদন করিয়াছ, এক্ষণে কে কাহার বিচার করিবে?'

মানব আরক্তলোচনে কহিল, 'আমার কয়েক জন কাঠুরিয়া যে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইল তাহার জন্য কেহই দণ্ড পাইবে না, এ কখনও হইতে পারে না।'

বনস্পতি ভীত হইয়া কম্পিত মর্মরস্বরে কহিল, 'প্রভু, তাঁহারা

সুবুদ্ধিসহকারে মানবচাতুরী অবলম্বন করিয়া কাণ্ড করিয়াছিলেন। আশ্চর্য কার্যনৈপুণ্যবশত অবিলম্বেই তাহার ফললাভ করিয়াছেন— আমি মূঢ় বৃক্ষ, তাহার প্রতিবিধান করি এমন সাধ্য ছিল না।'

মানব কহিল, 'কিন্তু তোমারই শাখা ভাঙিয়া পড়িয়াছিল, তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই।'



বনস্পতি কহিল, 'সে কথা যথার্থ, কারণ আমারই শাখায় তাঁহারা কুঠারাঘাত করিয়াছিলেন এবং প্রকৃতির নিয়ম অনিবার্য।'

মানব সুযুক্তিসহকারে কহিল, 'অতএব তোমাকেই দণ্ড স্বীকার করিতে হইবে। তোমার যাহা-কিছু বক্তব্য আছে বলিতে থাকো, আমি এক্ষণে কুঠারে শান দিতে চলিলাম।'

তাৎপর্য ঃ অনবধানবশত যদি হুঁচট খাইয়া থাকো, চৌকাঠকে পদাঘাত করিবে। সেই জড়পদার্থের পক্ষে এই একমাত্র সুবিচার।

15547

অনুশীলনী

১। 'নতুন কথামালা'—'নতুন' কথাটার মধ্যে কোন্ ভাব লুকানো আছে?

২। শেষের নীতিবাক্যটিতে মানুষকে কিভাবে একহাত নেওয়া হয়েছে ?

৩। গল্পটি সংক্ষেপে চলিত ভাষায় লেখো।

৪। অর্থ লেখো :

অবলম্বন, তরুসমীপে, স্কন্ধ, প্রতিবিধান, দণ্ড, অভিপ্রায়।

৫। সমাস ভেঙে লেখো :

শাখাচ্ছেদনে, শ্রমলাঘব, আরক্তলোচন, পদাঘাত।

৬। বাক্য রচনা করো :

আবশ্যক, কাণ্ড, মূঢ়, যথার্থ, অনিবার্য, একমাত্র।

সত্যপীর

রামেশ্বর

রামেশ্বর ভট্টাচার্য (বন্দ্যোপাধ্যায়): জন্ম—যদুপুর, মেদিনীপুর। কর্ণগড়ের জমিদার যশোবন্ত সিংহের সভাসদ কবি ছিলেন। 'শিবসঙ্কীর্ত্তন' ও 'সত্যপীরের পাঁচালি' কবিতাগ্রন্থ রচনা করেন।

বন্দিব জননী পদ পরম কারণ।
যাঁহার প্রসাদে দেখি এসব সৃজন॥
জনক জননী মধ্যে আগে বন্দো মা।
এতিন ভুবন মধ্যে সার যাঁর পা॥
বন্দিব জনক পদ জনমের দাতা।
চতুর্বর্গ সিদ্ধ যাঁর সেবায় সর্বথা॥
জগতের সার মাতা পিতার চরণ।
যেবা নাহি ভজে তার নিষ্ফল জীবন॥
কহে রামেশ্বর বাক্য না করিহ হেলা।
ভবাম্বুধি মধ্যে মাতা পিতা পদ ভেলা॥

অনুশীলনী

১। রামেশ্বরের লেখা পুঁথির নাম কী?
২। এই কবিতাংশে কবি কী কারণে এবং কার বন্দনা করেছেন?
৩। অর্থ লেখো:
পরম কারণ, জনকজননী, চতুর্বর্গ, ভবাম্বুধি।

৪। চলিত গদ্যে কী হবে লেখো :

বন্দিব, জনম, না করিহ হেলা, আগে বন্দো মা, যেথা, সৃজন।

৫। প্রথাসিদ্ধ দেবদেবীর বদলে মা-বাবার এই বন্দনার ভেতর দিয়ে কবি রামেশ্বরের কী স্বাতন্ত্র্য চোখে পড়ে ?

নাট্যের রূপ

শিশিরকুমার ভাদুড়ি



মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য ছিলেন ষোড়শ শতাব্দীর লোক। তাঁর বিবিধ চরিতগ্রন্থে দেখতে পাই যে, সে সময় দেশে বার মাসে তের পার্বণের মধ্যে নাট্যের ছিল বহুল প্রচলন। সম্পন্ন লোকের প্রাঙ্গণে, তুর্গোৎসবে, রাসলীলায়, দোলের উৎসবে নানাবিধ নাট্যের পালা পরম উল্লাসে অভিনীত হত। মহাপ্রভু নিজে উৎসাহের সঙ্গে নাট্যলীলায় অংশগ্রহণ করেছেন। তাঁর পার্ষদেরা তাঁর এই নাট্যোৎসবে প্রীতি ও আনন্দের সঙ্গে যোগদান ক'রে তাঁর উৎসাহ বর্ধন করেছেন।

সে সময় যাত্রা ছিল দেবপূজারই অঙ্গ। ভক্তিমূলক কৃষ্ণযাত্রারই প্রচলন ছিল সবচেয়ে বেশি। মহাপ্রভু নিজে রুক্মিণীর অংশ গ্রহণ

ক'রে লোকের মনে কৃষ্ণভক্তির স্রোত প্রবাহিত করেছেন। বৃদ্ধ অদ্বৈত পণ্ডিতও এই নাট্যলীলায় যোগদান করতে লজ্জা অনুভব করেন নি। নিত্যানন্দের তো কথাই নেই।

দেখা যায় ষোড়শ শতাব্দীতে বাংলায় যাত্রা ছিল সামাজিক জীবনের এক প্রধান অঙ্গ। শুধু তাই নয়, এ জিনিস তখন এত বহুলভাবে প্রচলিত ছিল যে, মনে হয় তুই তিন শত বর্ষ ধরে এই যাত্রা অবিচ্ছিন্নভাবে আমাদের সমাজে চলে আসছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রায় শেষভাগ পর্যন্ত ছিল যাত্রার লোকপ্রিয়তা।

কিছুকাল আগেও গ্রামে গ্রামে ভূস্বামীরা, তুর্গাপূজা, দোল ও রাস উপলক্ষ্য ক'রে বহুদিন ধরে নাট্যোৎসব করতেন। এখনও যাত্রার অপ্রচলন হয়নি তবে যাত্রার মূর্তি বদলেছে। অল্পদিন পূর্বেও যাত্রা ছিল দেব-দেবীর পূজার অঙ্গ। শুধু পূজার অঙ্গ নয়, লোক-শিক্ষারও অঙ্গ।

আমাদের দেশে লোক অক্ষর পরিচয়কেই শিক্ষার একমাত্র সোপান মনে করতেন না। বর্ণজ্ঞান না থাকলেও আমাদের দেশের নিরক্ষর কৃষক এই পৌরাণিক উপাখ্যানমূলক যাত্রার সাহায্যে হিন্দু-ধর্মের ও দর্শনের সঙ্গে মোটামুটিভাবে পরিচিত হতে সক্ষম হত।

জীবনের উচ্চ উচ্চ আদর্শগুলি, সত্যানুরাগ, পরোপচিকীর্ষা, পরার্থে আত্মত্যাগ, সতীধর্ম, পিতৃভক্তি, সৌহার্দ্য ও দেব-দ্বিজে ভক্তি যাত্রানুষ্ঠানের মাধ্যমেই লোকের মনে সংক্রামিত হত; কিন্তু অত্যধিক পুরাণপ্রিয়তা শেষকালে যাত্রাকে সমসাময়িক জীবন থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ক'রে ফেলল। নাটকে মানুষের সাধারণ জীবন ও তার বিবিধ সমস্যা আমাদের যাত্রার পালায় কোন রকম স্থান পেল না।

অত্যন্ত অবাস্তব জিনিস লোকপ্রিয় হয় না, লোকের কোন কাজেই আসে না। কাজে কাজেই যাত্রার লোকপ্রিয়তা নষ্ট হতে

লাগল আর অনাদৃত হবার অবশ্যম্ভাবী ফল, অধঃপতন ঘটতে লাগল।

অনুশীলনী

১। শিশিরকুমার ভাদুড়ি কে ছিলেন ?

২। চৈতন্যদেবের আমলে যাত্রার জনপ্রিয়তা কেমন ছিল দুচার কথায় লেখো।

৩। যাত্রার অবনতির কারণ কী ?

৪। অর্থ লেখো :

চরিতগ্রন্থ, বারমাসে তের পার্বণ, সংক্রামিত, অঙ্গ, বর্ণজ্ঞান, সৌহার্দ্য, পালা।

৫। বিশেষ্যরূপ লেখো :

বহুল, পৌরাণিক, অনাদৃত, অভিনীত, প্রবাহিত, নষ্ট।

৬। বিপরীতার্থক শব্দ লেখো :

বিচ্ছিন্ন, প্রধান, পরার্থ, উল্লাস, নিরক্ষর, পতন।

প্রলয়ের রঙ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আকাশের দূরত্ব যে, চোখে তারে দূর বলে জানি,
মনে তারে দূর নাহি মানি।
কালের দূরত্ব সেও যত কেন হোক না নিষ্ঠুর,
তবু সে দুঃসহ নহে দূর।
আঁধারের দূরত্বই কাছে থেকে রচে ব্যবধান,
চেতনা আবিল করে, তার হাতে নাই পরিত্রাণ,
শুধু এই মাত্র নয়,
সে-যে সৃষ্টি করে নিত্য ভয়।
ছায়া দিয়ে রচি তুলে আঁকাবাঁকা দীর্ঘ উপছায়া,
জানারে অজানা করে, ঘেরে তারে অর্থহীনা মায়া।
পথ লুপ্ত করে দিয়ে যে-পথের করে সে নির্দেশ,
নাই তার শেষ।
সে-পথ ভুলায়ে লয় দিনে দিনে দূর হতে দূরে
ধ্রুবতারাহীন অন্ধপুরে।

অনুশীলনী

১। 'কালের দূরত্বে'র চেয়েও 'আঁধারের দূরত্ব' কেন দুঃসহ?
২। 'প্রলয়ের রঙ' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
৩। কবিতাংশটির মর্মার্থ নিজের কথায় লেখো।
৪। অর্থ লেখো:

ব্যবধান, আবি ঃ পছায়া, লুপ্ত, ধ্রুবতারাহীন, অন্ধপুরে।

৫। বিশেষণরূপ লেখো:

নির্দেশ, দূরত্ব, ভয়, সৃষ্টি, পরিত্রাণ।

কুসংস্কারী ব্রাহ্মণ

কালিদাস রায়

(১৮৮৯-১৯৭৫) : জন্ম—কড়ুই গ্রাম, বর্ধমান। পিতা যোগেন্দ্রনারায়ণ। দর্শনে এম্ এ পাস ক'রে ভবানীপুরে মিত্র ইনস্টিটিউশনে শিক্ষকতা করেন। 'কবিশেখর' উপাধি পান। কবিতা, প্রবন্ধ, রম্যরচনা—সবই লিখেছেন।

বুদ্ধদেব যখন রাজগৃহের বিহারে বাস করিতেছিলেন, তখন রাজগৃহের সকলেই একে একে তাঁহার নিকট আসিয়া তাঁহার শ্রীমুখের বাণী শুনিয়া প্রকৃত ধর্মের মর্ম উপলব্ধি করিতে লাগিলেন।

একজন ব্রাহ্মণ বুদ্ধদেবকে এড়াইয়া চলিতেন এবং তাঁহার প্রচারিত ধর্মের বিরুদ্ধে নানা কথা বলিতেন। এ ব্যক্তির অগাধ ধনসম্পত্তি ছিল। যত প্রকারের কুসংস্কার সে যুগের হিন্দুসমাজে প্রচলিত ছিল, ব্রাহ্মণ সেগুলিকে কাঁটায় কাঁটায় মানিয়া চলিতেন।

এই ব্রাহ্মণের চৈতন্যোদয়ের জন্য তথাগত (বুদ্ধদেব) সুযোগ খুঁজিতেছিলেন।

ব্রাহ্মণ একদিন স্নানান্তে বস্ত্রপরিবর্তনের সময় জানিতে পারিলেন —তাঁহার বহুমূল্য একজোড়া কাপড়-চাদর ইঁদুরে কাটিয়াছে। শুনিয়া ব্রাহ্মণ চমকিয়া উঠিলেন।

ব্রাহ্মণের বিশ্বাস,—ঐ বস্ত্র যে পরিধান করিবে, তাহার এবং তাহার পরিবারস্থ সকলের মৃত্যু হইবে। যে স্পর্শ করিবে, তাহারও অমঙ্গল হইতে পারে।

ব্রাহ্মণ ঐ পরিচ্ছদ শ্মশানে ত্যাগ করিয়া আসিতে আদেশ

দিলেন। ভৃত্যদিগকে ঐ ভার দিতে পারিলেন না। ভয় — পাছে তাহারা লোভবশে উহা আপন গৃহে লইয়া যায়।

তিনি আপন পুত্রকে বলিলেন, 'একটা লাঠির ডগায় ঐ কাপড়-চাদর জড়িয়ে শ্মশানে ফেলে দিয়ে স্নান ক'রে বাড়ি এস। দেখো, যেন কিছুতেই ছুঁয়ো না।'

পুত্র পিতার আদেশমত মরা সাপকে যেমন লোকে লাঠির ডগায় করিয়া লইয়া যায়, সেইভাবে ঐ কাপড়-চাদর লইয়া শ্মশানে ফেলিতে গেল।

বুদ্ধদেব এই দৃশ্য দেখিলেন এবং ছেলেটির সঙ্গে সঙ্গে শ্মশানে গেলেন। তারপর ছেলেটি যেমন ঐ কাপড়-চাদর ফেলিয়া দিল অমনি তিনি তাহা কুড়াইয়া লইয়া কোমরে জড়াইতে লাগিলেন।

ছেলেটি হা হা করিয়া উঠিল। বুদ্ধদেব হাসিতে হাসিতে বেণু-বনের দিকে চলিয়া গেলেন।

পুত্র আসিয়া পিতাকে সংবাদ জানাইলেন। পিতা দেখিলেন—সর্বনাশ! এই বস্ত্র পরিধান করিয়া গৌতম বুদ্ধ ত দেহত্যাগ করিবেনই — তাঁহার শিষ্যসেবক সকলেরই মৃত্যু হইবে। মনে মনে বলিলেন, 'হায়, বিধর্মী নির্বোধ গৌতম! ইহার যে কী কুফল, তাহা ত' জান না।' ব্রাহ্মণ ভাবিলেন—এতগুলি নরহত্যার জন্য তিনিই দায়ী হইতে চলিলেন।

তখন তিনি গৃহে যত বস্ত্র ছিল, সমস্ত গাড়ির উপর চাপাইয়া এবং ধনরত্ন লইয়া বেণুবন বিহারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বুদ্ধদেবকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'গৌতম তুমি জান, ইঁদুরে-কাটা কাপড় পরলে কী ভীষণ অমঙ্গল হয়। তুমি এখনি ঐ বস্ত্র ত্যাগ কর। দেখ, তোমার ও তোমার শ্রমণগণের জন্য আমি কত বস্ত্র এনেছি! তোমার বস্ত্রক্রয়ের জন্য আমি সহস্র মুদ্রা দান করেছি।'

গৌতম বলিলেন, 'ব্রাহ্মণ, এসব বস্ত্র নিয়ে আমরা কি করব?

আমরা পথেঘাটে, জঞ্জাল-আবর্জনার মধ্যে শ্মশানে যে টুকরো টুকরো কাপড় পাই, তাই পরি। আমাদের অন্য বস্ত্র পরতে নেই; যে কাপড় ইঁদুরের-কাটা এবং শ্মশানে নিক্ষেপ করা সেই কাপড়ই আমাদের পরিধেয়। ব্রাহ্মণ, তুমি কুসংস্কারে অন্ধ, হাজার রকমের অলীক কাল্পনিক ভয়ে তুমি বেঁচে থেকেও মরে আছ। আমরা জগতে সকল ভয় জয় করেছি। যদি নির্ভয়ে বাঁচতে চাও— তবে আমরা যা করি তা-ই কর। কুসংস্কারগুলো তোমার ঘরে সাপের মত কিলবিল করছে, তুমি সাপের ডেরায় বাস করছ। সারারাত তুমি দুঃস্বপ্ন দেখ, সারাদিন তোমার সেই দুশ্চিন্তায় কাটে। স্বপ্নগুলোকে সত্য বলে বিশ্বাস ক'রে, তুমি কি যাতনাই না পাচ্ছ! প্রত্যেক জীবজন্তুর চলাফেরায় তুমি মঙ্গল অমঙ্গল খুঁজে অস্থির হচ্ছ! কাক ডাকলে তুমি চমকে ওঠ, পেঁচা ডাকলে তুমি ভয়ে ভাবো — স্বয়ং মৃত্যু ডাকছে, টিকটিকি পড়লে তোমার শান্তি নষ্ট হয়, রাত্রিকালে আকাশের দিকে তোমার চাইবার উপায় নেই — কখন উল্কাপাত দেখে ফেলবে। ভেবে দেখ দেখি, কি ভীষণ জীবনযাপন করছ!'

এইভাবে বুদ্ধদেব তাহাকে উপদেশ দিতে লাগিলেন। এই উপদেশে ব্রাহ্মণের চৈতন্যোদয় হইল।

অনুশীলনী

১। কুসংস্কারী ব্রাহ্মণ যখন গৌতম বুদ্ধের সঙ্গে দেখা করলেন, তখন দুজনের মধ্যে কী কথা হল সংক্ষেপে লেখো।

২। অর্থ লেখো:

মর্ম, চৈতন্যোদয়, পরিধান, বিধর্মী, শ্রমণ, নিক্ষেপ, অলীক।

৩। এখনও আমাদের মধ্যে যেসব কুসংস্কার টিঁকে আছে, তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দাও।

৪। বাক্য রচনা করো :

অগাধ, উপলব্ধি, কাল্পনিক, কিলবিল, হাঁ হাঁ, কাঁটায় কাঁটায়।

৫। বিপরীতার্থক শব্দ লেখো :

ত্যাগ, প্রকৃত, ডগা, মৃত্যু, অন্ধ, দুঃস্বপ্ন, ভয়।

দাসী পুত্র

যতীন্দ্রমোহন বাগচী

পরের দুয়ারে দাসী বটে আজি, তবু সে মোদেরই মা,—
ভুলিবারে চাই সতত সে-কথা ; ভুলিবারে পারি না ।
কাঙালের ঘরে যাহা কিছু জোটে, সে যে ধূলিমাখা খুদ,
উপবাসক্ষীণ শীর্ণ বক্ষে শুকায়ে গিয়াছে দুধ,—
তবু তাই খেয়ে বাঁচে এই প্রাণ, তাই দিয়ে এই দেহ,
ধুলামাটি মাখা তাহারি অঙ্কে বাঁধি দুদিনের গেহ,
হাঁটিতে শিখেছি যার হাঁটু ধরে, যে বুকে মেলিয়া পা,
হক ভিখারিণী — তবু সে জননী, কেমনে ভুলিব তা ?

এস তপস্বী, উগ্রশক্তি, এস হে কর্মবীর,
কর দৃঢ় পণ মায়ের চক্ষে মুছাতে অশ্রুনীর ;
পায়ে-পায়ে যত বিভেদের বাধা ভুলায়ে পরস্পরে
ভায়ে-ভায়ে আজি মিলাইতে হবে জননীর ভাঙা ঘরে ;
এস হে হিন্দু, এস খ্রীষ্টীয়, পারসী, মুসলমান,
যে মায়ের বুকে জন্ম তোমার, রাখ আজি তাঁর মান
যে-জননী আজ ভিখারিণী হয়ে ভুলে   আপন বাণী,
অর্জিয়া তাঁরি ধর্মরাজ্য কর তাঁরে রাজরাণী ।

অনুশীলনী

১। কবির চোখে মা আর দেশমাতা কিভাবে একাকার হয়ে গেছে, নিজের কথায় বুঝিয়ে বলো ।

২। 'যে জননী আজ ······ কর তাঁরে রাজরাণী।'

এই দু ছত্রের মধ্যে কবি ইঙ্গিতে কী বোঝাতে চেয়েছেন লেখো।

৩। অর্থ লেখো :

অঙ্ক, পণ, উগ্রশক্তি, বাণী, ধর্মরাজ্য, দাসী, উপবাসক্ষীণ।

৪। চলিত গদ্যে কী রূপ হবে লেখো :

মোদের, ভুলিবারে, গেহ, অর্জিয়া।

৫। এই কবির অন্য কোনো কবিতা পড়েছ কি? তাঁর লেখা কোনো কবিতার বইয়ের নাম জানা থাকলে লেখো।

চণ্ডীচরণের গান

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

শোন বলি। লালপুরের বাজারে হলদিয়ার চণ্ডীচরণের মুদী দোকান আছে। অনেক দিনের দোকান, চণ্ডীচরণের বাবার আমলের। চণ্ডীচরণের বাবা খদ্দেরকে ঠকাত না কিনা, চণ্ডীচরণও বাবার কাছ থেকে খদ্দেরকে না ঠকিয়ে জিনিস বেচে লাভ করার কায়দাটা ভালো ক'রে শিখে নিয়েছে কিনা, দোকানটা তাই বেশ চলে।

লালপুর হল মফস্বলের ছোট একটা শহর আর হলদিয়া হল তার গায়ে লাগান একটা গ্রাম। লালপুরের বাজার ভেদ ক'রে যে বাঁধান রাস্তাটা দক্ষিণ দিকে গেছে, সেটা ধরে চলতে চলতে ভালো ক'রে পা ব্যথা হবার আগেই শহরের সীমানা পার হয়ে হলদিয়ায় পৌঁছান যায়। তবে শহরের সীমানাটা যে ঠিক কোন্‌খানে, শহরের লোকেও তা জানে না, গ্রামের লোকেও তা জানে না। ভারতবর্ষ আর আফগান রাজ্যের সীমানা তো নয়, রাস্তাটা তো খাইবার পাস নয়, লালপুরের মিউনিসিপ্যালিটিও তো আর ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট নয় যে সীমানায় নোটিশ টাঙিয়ে রাখা দরকার মনে করবে। যার যখন খুশি, যতবার খুশি সীমানা পার হয়ে শহর থেকে গ্রামে আর গ্রাম থেকে শহরে যাতায়াত করতে কোন বাধাই নেই।

দোকান বন্ধ ক'রে চণ্ডীচরণকে রোজ রাত প্রায় এগারটার সময় এই সীমানা ডিঙিয়ে বাড়ি ফিরতে হয়। ফিরতে হয় একাই, সঙ্গী জোটে কদাচিৎ। মফস্বলের ছোট শহর তো, রাত এগারটা মানেই রাত দুপুর।

বাজার অঞ্চলটুকু পার হয়ে গেলেই চারিদিক নিঝুম, ঘুমন্ত। কোন বাড়ির জানালায় যদি বা একটু আলো থাকে, বেশ বোঝা

যায় আলোটা নিবু নিবু ক'রে কমিয়ে ভেতরে সবাই ঘুমিয়েছে। এ রাস্তাটার ধারে কোন বাড়ির ছেলে যেন পরীক্ষার পড়া পর্যন্ত করে না। যাতায়াত ক'রে ক'রে অভ্যাস হয়ে গেছে, তবু ভয় যে চণ্ডী-চরণের একেবারে করে না, তা নয়। ডান হাতে একটা মোটা লাঠি নেয় আর অন্ধকার রাত্রি হলে বাঁ হাতে নেয় একটা লণ্ঠন, নিয়ে কোনদিন জোরে জোরে কোনদিন আস্তে আস্তে হাঁটতে থাকে। কিছুদূর গেলেই দুপাশে বাড়িঘর কমে আসে, আম-কাঁঠালের বাগান, কলা বাগান, বাঁশবন, পুকুর, ডোবা, পোড়ো-জমি ডাইনে-বাঁয়ে দেখা দিতে থাকে। মাঝে মাঝে এলোমেলো ভাবে ছড়ানো কাঁচা-পাকা বাড়ি নিয়ে ছোট-বড় পাড়া। তখন চণ্ডীচরণ গলা ছেড়ে ধরে দেয় গান।



ঠিক যে ভয় চাপা দেবার জন্যেই গান ধরে দেয় তা নয়, কতকটা মনের আনন্দে গান করে। বয়স কম, স্বাস্থ্য ভালো, দোকানে বেশ লাভ হচ্ছে, বাড়িতে মা, বৌ, ভাই, বোন সবাই ভালবাসে, সারাদিন খেটেখুটে নির্জন পথ দিয়ে বাড়ি ফিরবার সময় গলা ছেড়ে গান ধরে দেওয়া আশ্চর্য কি?

গান অবশ্য চণ্ডীচরণ জানে না, কিন্তু গান না জানলে কি গাইতে নেই? রাত্রে হাঁক দেবার কম্পিটিশনে যে চৌকিদার মেডেল পাবে, চণ্ডীচরণের গলার আওয়াজ অবশ্য তার মতোই হবে, কিন্তু গলা মিষ্টি না হলে কি গাইতে নেই? যতদিন গলা থাকে ততদিন মাঝে মাঝে সবাই গায়। গলা থাকার ওটা একটা প্রমাণ।

একদিন হয়েছে কি, পূর্ণিমার কাছাকাছি রাত বলে চমৎকার জ্যোৎস্না উঠেছে। আর শরৎকাল বলে প্রায় প্রত্যেক বাড়িতে ছু-চারজন ক'রে ম্যালেরিয়ায় ভাজা হচ্ছে। কেবল বাঁশের লাঠিটা হাতে নিয়ে চণ্ডীচরণ তিন-চারটা শোনা গানের ছু-চার লাইন যা মনে ছিল একত্র ক'রে নিজের তৈরি সুরে গাইতে গাইতে বাড়ি ফিরছিল। শহরের অজানা সীমানার কাছাকাছি যে পাকুইতলা বলে একটা পাড়া আছে, সেখানে পাড়ার সাত-আটজন মানুষ তাকে ঘিরে ধরল। তারপর তলব করা হল তার কৈফিয়ৎ। হাজারবার বারণ ক'রে দিলেও রাত ছুপুরে গাধার মত চেঁচাবে, ঘাড়ে তার কটা মাথা শুনি?

এ পাড়ায় চণ্ডীচরণের খদ্দের নেই, সে তাই গাধার মতো চেঁচায় কেন, তার কৈফিয়তে বলল, 'দশটা মাথা। রাবণ রাজার কটা মাথা ছিল বলুন তো?'

অনুশীলনী

১। দোকান বন্ধ ক'রে চণ্ডীচরণকে রোজ রাত প্রায় এগারোটায় বাড়ি ফিরতে হয় — তার এই যাতায়াতের পথের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

২। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুটি নামকরা উপন্যাসের নাম লেখো।

৩। বাক্য রচনা করো ঃ

নিঝুম, অভ্যাস, এলোমেলো, তলব, কৈফিয়ত, খদ্দের।

৪। বিপরীতার্থক শব্দ লেখো ঃ

বাঁধানো (রাস্তা), লাভ, ঘুমন্ত, নির্জন, একত্র, পূর্ণিমা।

৫। নিচের বাক্যটি ঠিকভাবে সাজিয়ে লেখো ঃ

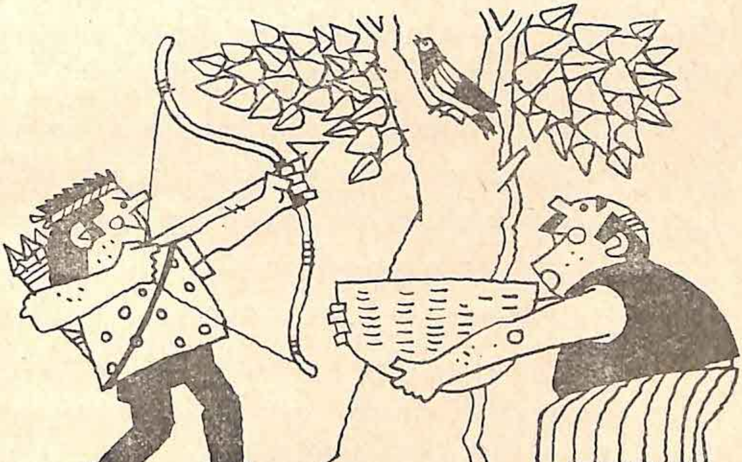
রোজ প্রায় রাত এগারটার এই সময় দোকান সীমানা চণ্ডীচরণকে বন্ধ ক'রে ডিঙিয়ে হয় ফিরতে বাড়ি।

ফস্‌কে গেল !

স্কুমার রায়

(১৮৮৭ - ১৯১৩) : জন্ম—কলকাতা। বিখ্যাত শিশুসাহিত্যিক উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর পুত্র। ছড়া, গল্প, গান, প্রবন্ধ, নাটক লিখতেন হাসির রসে ভরিয়ে। ছবিও আঁকতেন।

দেখ্ বাবাজি দেখ্‌বি নাকি দেখ্‌রে খেলা দেখ্ চালাকি,
ভোজের বাজি ভেল্কি ফাঁকি পড়্ পড়্ পড়্ পড়্‌বি পাখি—ধপ্
লাফ দি' রে তাই তালটি ঠুকে তাক ক'রে যাই তীর ধনুকে,
ছাড়ব সটান উর্ধ্বমুখে হুশ্ ক'রে তোর লাগবে বুকে—খপ্



গুড়্ গুড়্ গুড়্ গুড়িয়ে হামা খাপ্ পেতেছেন গোষ্ঠ মামা,
এগিয়ে আছেন বাগিয়ে ধামা, এই বারে বাণ চড়িয়ে নামা — চট্ !
ঐ যা ! গেল ফস্কে যে সে — হেঁই মামা তুই ক্ষেপ্‌লি শেষে ?
ঘ্যাচ্ ক'রে তোর পাঁজর ঘেঁষে লাগ্‌ল কি বাণ ছট্‌কে এসে — ফট্ ?

অনুশীলনী

১। কবিতাটি মুখস্থ লেখো।

২। 'ঘ্যাচ্ ক'রে তোর পাঁজর ঘেঁষে লাগল কি বাণ ছট্‌কে এসে — ফট্?' পড়তে গিয়ে কোথায় কোথায় থামছ, পাশে লম্বা লম্বা দাঁড়ি বসিয়ে দেখাও।

৩। অর্থ লেখো :

ভোজের বাজি, উর্ধ্বমুখে, ভেল্কি, খাপ, ধামা, বাণ।

৪। ভেতরে ভেতরে মিল দেওয়া শব্দগুলো লেখো।

৫। সুকুমার রায়ের আর কী লেখা পড়েছ? সে সম্বন্ধে দু চার কথা লেখো।

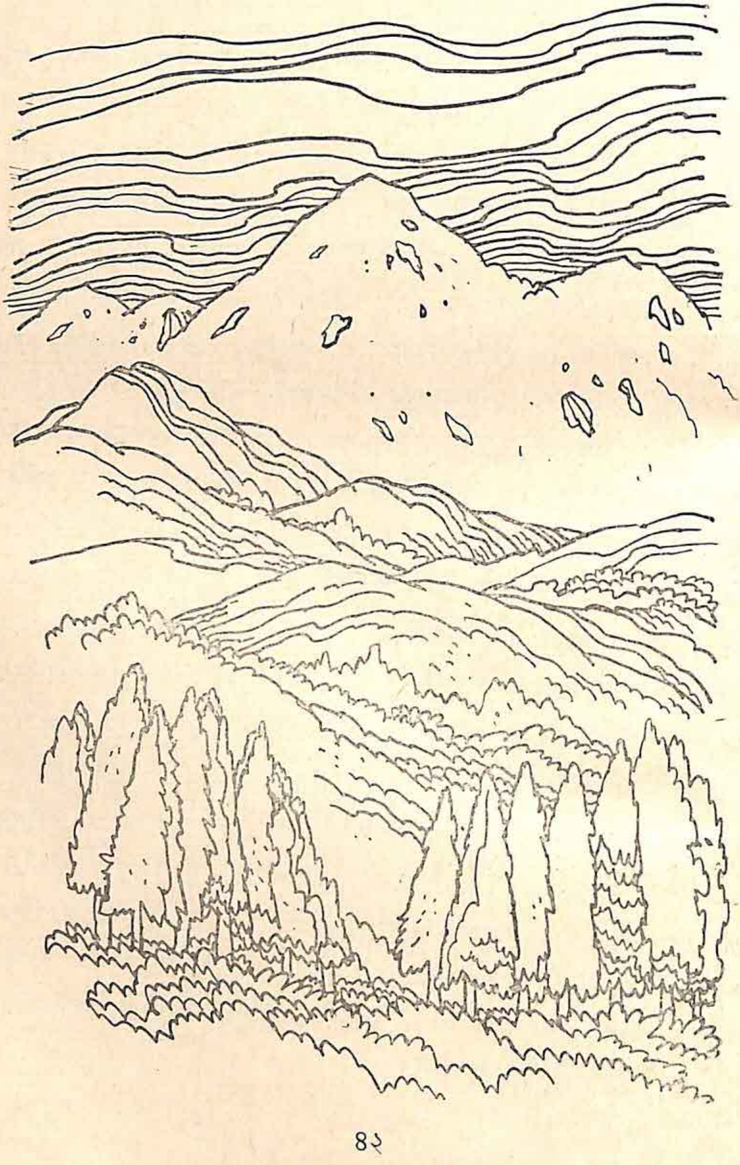
হিমালয়

প্রবোধকুমার সান্যাল

আজ আমার নীলোজ্জ্বল আকাশে ছিল শুভ্র মেঘদল। যতদূর দৃষ্টি চলে, হরিৎ-নীল পার্বত্য অরণ্যানী। নীচের দিকে গভীর গিরিখাদ। শতদ্রু আবার গেছে হারিয়ে। হাজার-হাজার মানব-কীট চারিদিকের পাহাড়ের কণ্ঠলগ্ন হয়ে রয়েছে, — কিন্তু এই দিগন্তজোড়া পার্বত্য পরিব্যাপ্তির মধ্যে তাদের অস্তিত্বের কোনও সাড়া নেই। সব যেন নিষ্কম্প, নিশ্চুপ, — এ যেন মহাস্থবির এক জটাধারীর জপের মালায় কল্প-গণনা চলছে বিশ্বব্যাপী স্তব্ধতার মধ্যে। আমিও যেন চোখ বুজে শুনছিলুম সেই জপের বীজমন্ত্র।

হিমাচলের এই বীজমন্ত্রপাঠ যাদের কানে গুঞ্জন তুলেছে একবার, সেই দুঃখজয়ীদের মন ঘরে থাকেনি। দূর দেবালয়ের ঘণ্টার মতো তারা দূরান্তরের ডাক শুনে ছিন্নবাধা পলাতকের মতোই বেরিয়ে পড়ে — যেদিকে দুর্যোগ, যেদিকে দুস্তর ও অনধিগম্য, যেদিকে দুঃখ, সহিষ্ণুতা, মৃত্যুভয় এবং অনশন। কিন্তু আবার এরাই হল সেই দুষ্টশক্তি, সেই বাধাবিপত্তি, যারা পরিব্রজ্যা ও আনন্দের পথ অবরোধ ক'রে দাঁড়ায়। অথচ এই ডাক যত সত্য হয়, ততই শক্তিদায়ক হয়ে ওঠে। এই ডাক তাদেরকে নিয়ে যায় অরণ্যে, গিরিখাদে, তুষারলোকে, দুরন্ত জলস্রোতে এবং বিশ্বব্যাপী নিঃসঙ্গতার মধ্যে। তাদের মন মিলিয়ে থাকে বিপাশায়, বিতস্তায়, চন্দ্রভাগায় আর শতদ্রুর পাথরে-পাথরে। আপন কস্তূরীর উগ্র গন্ধ কোথাও তাদেরকে স্থির থাকতে দেয় না। সেই আত্মতাড়নায় কেঁদে বেড়ায় মন। তারই বেদনা স্পর্শ করে দেওদারের শীর্ষে, চীড়বনের মর্মরে, ইরাবতীর উল্লোলে, আর অরণ্যপক্ষীর চূর্ণ কণ্ঠে।

আমি বিদায় নিচ্ছিলুম হিমাচলের কাছে। অশ্বক্ষুরাকৃতি বৃহৎ শৈলনগরী শিমলাকে কেন্দ্র ক'রে পরিভ্রমণ করলুম শিরমূর আর নাহান, মাহাসু আর মণ্ডি, লুরি আর রামপুর, সুন্দরনগর, রেবল ও



রেণুকা। বিদায় নেবার কালে আমার আচমনী মন্ত্র রেখে যাব এখানকার বয়লুগঞ্জ থেকে মশোব্রায়, যক্ষপর্বতের চূড়া থেকে লোয়ার শিমলা ও আনানদেলে, প্রস্‌প্রেক্ট পাহাড় থেকে আরম্ভ ক'রে কুফরি, নাওদেরা, তারাদেবী আর পাতিয়ালার নিজস্ব জনপদ চাইল্ অবধি। সোলন, কসৌলি, ডগসাই, থিয়োগ, — এরা আমার বহুকালের পরিচিত। যাদের সঙ্গে একদা এখানে মিলিয়ে ছিলুম, যারা রাঙিয়ে ছিল মন, যারা এই হিমাচলের বনে-উপবনে আমার পায়ে একদা কাঁটা ফুটিয়েছিল, পাইন বনের তলায়-তলায় ওয়াইল্ড ফ্লাওয়ার হল্-এর আশেপাশে, যুঙ্গনদীর আনাচে-কানাচে যারা বুকের রক্ত ঝরিয়ে ছিল, যারা আমার কপালের ঘাম দেখে পরিহাসমুখর হয়ে উঠত, — আজ তারা কে কোথায় যেন সব হারিয়ে গেছে। সেই শিমলা আছে, অনেক বড় হয়েছে, বহু প্রাসাদ উঠেছে, বহু পথ কাটা হয়েছে, — কিন্তু আমার সেই শিমলা নেই। সে হারিয়ে গেছে চিরকালের জন্য। আমি তারই উদ্দেশে আমার আচমনীমন্ত্র রেখে যাই।

উত্তর হিমালয়ে এবারের মতো আমার বাসনা-বেদনা ছড়িয়ে থাক, গিরিনির্ঝরের ধারায় থাক আমার সেই চিরকালের সুখস্বপ্ন-জাল। এবার যেন আবার শুনছি সেই দেবালয়ের ক্লান্ত ঘণ্টার ডাক মধ্য হিমালয়ের মহাভারতীয় পর্বতমালার জটিল রহস্য পথ থেকে।

অনুশীলনী

১। হিমালয়ের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার সময় লেখকের কী ভাবের উদয় হয়েছিল সংক্ষেপে নিজের কথায় লেখো।

২। হিমালয়সংলগ্ন কয়েকটি জায়গার নাম লেখো।

৩। সন্ধিবিচ্ছেদ করো :

নীলোজ্জ্বল, নিষ্কম্প, উদ্দেশ, উল্লোল, দেবালয়।

৪। সমাস ভেঙে লেখো ঃ

কণ্ঠলগ্ন, ছিন্নবাধা, অশ্বক্ষুরাকৃতি, গিরিনির্ঝর, সুখস্বপ্নজাল, দূরান্তর।

৫। অর্থ লেখো ঃ

অরণ্যানী, বীজমন্ত্র, অবরোধ, উগ্র, কস্তূরী, পরিহাস, মহাস্থবির, আচমনীমন্ত্র।

কাণ্ডারী হুঁশিয়ার

কাজী নজরুল ইসলাম

(১৮৯৮-১৯৭৬) : জন্ম—আসানসোলের কাছে চুরুলিয়া গ্রামে। পিতা কাজি ফকির আহম্মদ। স্ত্রী প্রমীলা সেনগুপ্তা। স্কুলজীবনেই সৈন্যবিভাগে যোগ দেন। পরে সে কাজ ছেড়ে সাহিত্য ও সঙ্গীত সাধনা করেন। তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'অগ্নিবীণা', 'বিষের বাঁশী' প্রভৃতি।

দুর্গম গিরি কান্তার মরু, দুস্তর পারাবার —
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি-নিশীথে, যাত্রীরা হুঁশিয়ার।

দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, ভুলিতেছে মাঝি পথ,
ছিঁড়িয়াছে পাল, কে ধরিবে হাল, আছে কার হিম্মৎ ?
কে আছ জোয়ান, হও আগুয়ান, হাঁকিছে ভবিষ্যৎ।
এ তুফান ভারী, দিতে হবে পাড়ি, নিতে হবে তরী পার।

তিমির রাত্রি, মাতৃমন্ত্রী-সান্ত্রীরা, সাবধান !
যুগযুগান্তসঞ্চিত ব্যথা ঘোষিয়াছে অভিযান।
ফেনাইয়া উঠে বঞ্চিত বুকে পুঞ্জিত অভিমান,
ইহাদেরে পথে নিতে হবে সাথে, দিতে হবে অ ।

অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া, জানে না সন্তরণ,
কাণ্ডারী ! আজি দেখিব তোমার মাতৃমুক্তিপণ !
'হিন্দু না ওরা মুসলিম ?' ওই জিজ্ঞাসে কোন্ জন ?
কাণ্ডারী ! বলো ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মা'র।

অনুশীলনী

১। নজরুল ইসলাম সম্বন্ধে যা জানো লেখো।

২। প্রথম ছ লাইন মুখস্থ লেখো।

৩। অর্থ লেখো :

গিরি, কান্তার, হিম্মৎ, তিমির, পুঞ্জিত, কাণ্ডারী।

৪। কবিতাংশটির মর্মার্থ লেখো।

৫। বাক্য রচনা করো :

হুঁশিয়ার, জোয়ান, পাড়ি, পাল, হাল।

৬। 'কাণ্ডারী' কথাটিতে কিসের ইঙ্গিত আছে?

বিন্দু, পান্না

রমাপদ চৌধুরী

(১৯২২ -   ) : খড়্গপুরে কৈশোর কেটেছে। প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ইংরেজি সাহিত্যে এম্ এ পাস করেন। ২৫ বছর বয়স থেকেই সাহিত্য সাধনা করছেন। এখন সাংবাদিকতাও করেন। আনন্দ পুরস্কার (১৯৬৩) এবং রবীন্দ্র পুরস্কার (১৯৭১) অর্জন করেছেন।

আমার পকেটে তখন একটা চকচকে রুপোর টাকা। তখন কাগজের টাকার চল হয় নি। তখন টাকায় সত্যি সত্যি রুপো থাকতো।

কাশী থেকে সেবার আমার দাদামশাই এসেছিলেন। যাবার সময় তাঁর কালো কোটের পকেট থেকে একটা টাকা বের ক'রে আমাকে দিলেন। বললেন, মিষ্টি খাবে।

আমি লাজুক লাজুক মুখ ক'রে মাথা নাড়লাম। নিতে চাইলাম না।

মা হেসে বললে, নে বিন্তু নে, অত লজ্জা করতে হবে না।

আমি নিলাম। পকেটে রাখলাম। তখন তো আমি রাজা। একটা টাকা দিয়ে কি কিনবো ভাবতে হলো না। কারণ সেটা মনে মনে ঠিক ক'রেই রেখেছিলাম। কিন্তু তার আগে ভেবে নিতে ভালো লাগছিল কি কি কেনা যায়। মনে হচ্ছিল একটা টাকা দিয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কিনে ফেলা যায়।

হাবুল ছিল আমার খুব বন্ধু। বাড়ির কাছেই থাকতো। তাকে দেখালাম টাকাটা, গর্ব ক'রে বললাম, দাদামশাই দিয়ে গেছে।

হাবুল কি কি যেন কিনে ফেলতে বলল। আমি বললাম, দূর ও সব কি হবে। আমি একটা কলম কিনবো, ফাউণ্টেন পেন।

তখন সত্যি এক টাকায় একটা ব্ল্যাকবার্ড কলম কেনা যেত। দরকার হয়, চার আনা আট আনা মা'র কাছে চেয়ে নেবো।

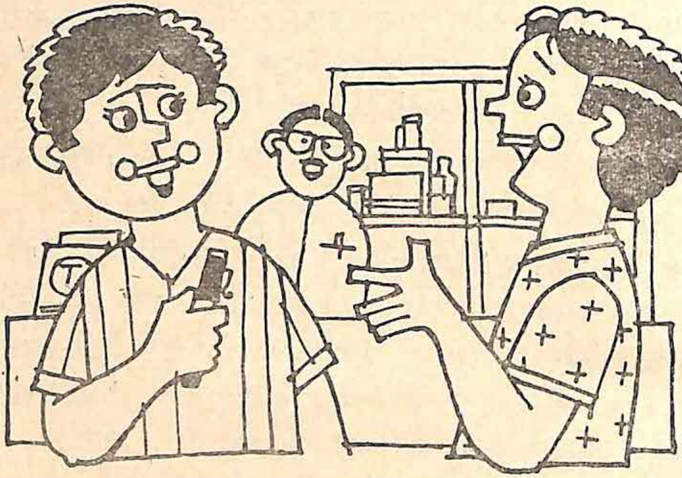
সত্যি চেয়ে নিয়েছিলাম। নিয়ে হাবুলকে একদিন বললাম, চ' হাবুল, একটা কলম কিনবো।

প্যাটেলের দোকানে শো-কেসে অনেক কলম সাজানো থাকতো দেখেছিলাম।

হাবুলকে সঙ্গে নিয়ে প্যাটেলের দোকানে হাজির হলাম। বললাম, যত রকম কলম দেখাতে।

কত রকমের কলম। কোনটা দামী, কোনটা শস্তা।

আমি দেখছি, হাবুল দেখছে, লোভ হচ্ছে সব কটাই কিনে ফেলার।



শেষ অবধি একটা ব্ল্যাকবার্ডই পছন্দ হল।

সেটা হাতে নিয়ে দেখছি, টাকাটা দেবো দেবো, হাবুল বলল — কালি নিবি না এক শিশি?

বলেই কালি দেখাতে বলল। লোকটা মই বেয়ে উঠলো, হাফ-সিলিং থেকে কালির শিশি নামাবার জন্যে।

আর তখনই হাবুল আমার পিঠে হাত দিয়ে, একটু ঠেলা দিয়ে বলে উঠলো, বিনু, পালা!

বলেই ছুটতে আরম্ভ করলো।

আর আমি কিছু বুঝে ওঠার আগেই আমিও ওর পিছন পিছন ছুটছি। কেন তাও জানি না।

অনেকখানি ছুটে এসে হাবুল বলল, চেনে না তো!

আমি বোকার মতই বললাম, চেনেই তো, বাবাকেও চেনে।

তখন আমাকে বোধহয় খুব উদ্‌ভ্রান্তের মত লাগছিল। এখন বুঝতে পারি, তখন আমি কি ভাবছিলাম। ভয়ে লজ্জায় কেন আমার চোখ ঠেলে জল এসেছিল।

আসলে ও লোকটা আমাকে চেনে বলে আমার কোন দুর্ভাবনা ছিল না। আমি শুধু ভাবছিলাম। আমি তো নিজেকেই চিনতাম না। দু'মিনিট আগেও ভাবতে পারতাম না আমি ছুটে পালাচ্ছি।

তারপর থেকে আমার আর নিজের সম্পর্কে কোন গর্ব নেই, অহঙ্কার নেই।

সব সময়ে আমার শুধু একটাই ভয়।

এক্ষুনি হয়তো পিঠের ওপর একটা হাতের স্পর্শ পাবো। এক্ষুনি হয়তো কেউ পিঠে হাত দিয়ে ঝট ক'রে বলে উঠবে, বিনু পালা।

অমনি সঙ্গে সঙ্গে আমি হয়তো ছুটতে শুরু করবো।

তুমি যতই নিজেকে চেনো না কেন, তুমি জানো না কে কখন তোমার পিঠে হাত দিয়ে বলে উঠবে, বিনু পালা। আর তখন তুমি আমার মতোই ছুটতে শুরু করবে। সাবধান, সাবধান!

অনুশীলনী

১। লেখাটির শেষে পলায়নী মনোবৃত্তির ফাঁদে পড়ার বিরুদ্ধে লেখক সাবধান করেছেন। কেন ?

২। তোমার কি কখনও এ রকম অভিজ্ঞতা হয়েছে ?

৩। লেখকের ছেলেবেলায় জিনিসপত্রের দাম কত শস্তা ছিল। কিন্তু দেশের লোকের তখন কেনবার ক্ষমতা ছিল কি রকম ?

৪। অর্থ লেখো ঃ

ব্ল্যাকবার্ড, শো-কেস, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, উদ্‌ভ্রান্ত, অহঙ্কার, স্পর্শ।

৫। আজ যদি তোমাকে কেউ পঞ্চাশটা টাকা দেয়, কি ভাবে তুমি তা খরচা করবে ?

শেষ ক্ষমা

দিনেশ দাস

(১৯১৩-১৯৮৫) : জন্ম-কলকাতা। স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে পাস ক'রে নানাবিধ কাজ করেন। শেষে চেতলা হাই স্কুলে শিক্ষকতা করেন। তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'কাস্তে' লিখে 'কাস্তে কবি' নামে খ্যাত হন। 'রাম গেছে বনবাসে' কাব্য গ্রন্থ লিখে 'রবীন্দ্র পুরস্কার' পান।

যখন অন্তিম গুলি হৃদ্‌পিণ্ডে বিঁধেছে সজোরে
তুমি করজোড়ে
খুনীর নিকট হতে পৃথিবীর কাছ হতে অনন্ত নিখিলে
ক্ষমা চেয়ে নিলে :
হেসেছিলে হাসি হিরণ্ময় ?
যে-হাসিতে নিশুতি প্রভাত হয়
কয়লার মত কালো অন্ধকার গ'লে পড়ে হীরক-সকালে !
হাজার বছর যেন ব'য়ে গেল এলোমেলো লুয়ের মতন
হাওয়ার উজান ঠেলে চেয়ে ছাখো, পুরাতন
ইন্দ্রপ্রস্থ হতে বেথেলেম
কত না প্রাণের মরু পেরিয়ে এলেম,
চিনেছি তোমায় আমি তুমি সেইজনা
কাঁটার মুকুট প'রে দুর্জনের তরে তবু চেয়েছ মার্জনা,
এইবার জোড়হাতে
শেষ-ক্ষমা চেয়ে নিলে ঘাতকের চরম আঘাতে।

হাজার বছর ধ'রে
জীবন-মরুভূ শুধু ধু-ধু করে রুক্ষ অনাদরে
হা-হা করে তপ্ত-তাম্র অগ্নির বলয়,
হঠাৎ কখন ওঠো বুদ্ধ-হিমালয়
ছেয়ে দাও করুণা-করুণ ঘন মেঘের বন্যায় —
তুমি জন্ম নাও আর মানবতা নবজন্ম নেয়।

অনুশীলনী

১। 'যখন অন্তিম গুলি হৃদ্‌পিণ্ডে বিঁধেছে সজোরে' — এই ছত্রে কার গুলিবিদ্ধ হওয়ার কোন্ ঘটনাটির কথা বলা হয়েছে?

২। কবিতাটি কার কথা মনে ক'রে লেখা? কবি কিভাবে তাঁর মাহাত্ম্য কীর্তন করেছেন?

৩। অর্থ বলো :

অন্তিম, করজোড়ে, লু, উজান, ইন্দ্রপ্রস্থ, বেথেলেম, ঘাতক, বলয়।

৪। এ কবিতায় অন্য কোন্ মহাপুরুষকে তুলনীয় ক'রে দেখানো হয়েছে?

বর্ণ ও জাতি

হিতেশরঞ্জন সান্যাল

বৃত্তিগত সাফল্য থেকে যেসব ভাগের উদ্ভব হয়েছে তার কয়েকটা উদাহরণ দিচ্ছি।

আদিতে তেলীরা সম্ভবত ঠুলি লাগানো এক-বলদে টানা ও পিঁড়িযুক্ত ঘানিতে পিষে তেল বার করত। পিঁড়িটি ঘানি গাছের গায়ে আটকান। তার ওপর ভর দিয়ে বসে তেলী বলদের পেছনে ঘুরতে থাকে।

পরবর্তীকালে কিছু তেলী উন্নত ধরনের ঘানি প্রস্তুত করে। এই ঘানি দুই বলদে টানা ও পিঁড়িবিহীন। বলদের চোখে ঠুলি দিতে হয় না, তেলীকেও বলদের সঙ্গে ঘুরতে হয় না। কারণ, এই যন্ত্র চালাবার জন্য তেলীর ভর দিয়ে বসবার প্রয়োজন নেই। সে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ঘানিটি চালায়। এতে তেলীর পরিশ্রম কম, কিন্তু বেশি তেল বার করা যায়।

দুই-বলদিয়া তেলীরা স্বতন্ত্র ভাগে পরিণত হল এবং উচ্চতর সামাজিক মর্যাদা দাবি করল।

সুবর্ণবণিকদের কর্জনা সমাজভুক্ত কিছু লোক পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে সপ্তগ্রাম বন্দরে ব্যবসা-বাণিজ্য ক'রে বিলক্ষণ বিত্তবান হয়ে ওঠে। এরা কর্জনা সমাজ থেকে বেরিয়ে এসে স্বতন্ত্র সপ্তগ্রামী সমাজ পত্তন করে। আদি ও নতুন সমাজের মধ্যে সামাজিক আদান-প্রদান বন্ধ হয়ে যায়।

তাম্বুলী বণিকদের বিয়াল্লিশগ্রামী সমাজের একটা অংশ সমাজ ছেড়ে আরো কিছু স্বজাতিকে একত্র ক'রে চৌদ্দগ্রামী সমাজ সৃষ্টি করে। চৌদ্দগ্রামী সমাজের লোকেরা খুব বিত্ত ও প্রতিপত্তিসম্পন্ন

হয়ে ওঠে। তাম্বুলী বণিকদের মধ্যে চৌদ্দগ্রামী সমাজের মর্যাদা সবার ওপরে।

তাঁতিদের মধ্যে বসাকরা ও শেঠ-বসাক সমাজ সর্বোচ্চ। এরা কাপড় বোনা ছেড়ে দিয়ে কাপড়ের ব্যবসা ক'রে বিত্তশালী হয় এবং স্বতন্ত্র ভাগ প্রতিষ্ঠা করে।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায় ভাগের কারণ সাংস্কৃতিক পার্থক্য। একটু আগেই বলেছি নিম্নতর পর্যায়ের জাতিগুলো সর্বসময়েই চেষ্টা করেছে স্মার্ত ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির উপাদান নিয়ে নিজে-দের সংস্কৃতি সমৃদ্ধ ক'রে তুলতে। তাদের কাছে এটা উচ্চতর মর্যাদা অর্জনের অন্যতম উপায়।

কোনো জাতির একটা অংশ যদি অন্যদের তুলনায় একটু বেশি এগিয়ে যায় তবে সেইটাই হয় তার স্বাতন্ত্র্যের ভিত্তি। সংশ্লিষ্ট অংশটি তখন উচ্চতর মর্যাদার দাবি নিয়ে নতুন একটা ভাগ পত্তন করে।

ওড়িশার সেরাইকেল্লা অঞ্চলে তেলীদের মধ্যে রাঢ়ী, শিখরিয়া ও মগহিয়া নামে তিনটি ভাগ আছে। রাঢ়ীরা শিখরিয়াদের তুলনায় নিজেদের শ্রেষ্ঠ মনে করে। কারণ, তাদের মধ্যে বিধবাবিবাহ উঠে গেছে, কিন্তু শিখরিয়ারা বিধবাদের বিয়ে দেয়।

শিখরিয়ারা আবার মনে করে, তারা মগহিয়া তেলীর তুলনায় শ্রেষ্ঠ। কারণ, মগহিয়ারা মদ ও মুরগির মাংস খায়, তারা খায় না। ফলে, মগহিয়ারা তাদের তুলনায় অশুদ্ধ।

বিধবাবিবাহ, মদ ও মুরগি প্রভৃতি অশুচি মাংস খাওয়া, বিয়েতে সংস্কৃত মন্ত্র পড়া (যত অশুদ্ধভাবেই হোক না কেন) ইত্যাদি উপলক্ষ্যে বহু অন্ত্যজ ও অজলচল জাতির মধ্যে নতুন নতুন ভাগ সৃষ্টি হয়েছে।

অনুশীলনী

১। এদেশে জাতিভেদ প্রথায় বৃত্তিগত সাফল্যের কিভাবে প্রভাব পড়েছে দেখাও।

২। প্রাচীন সমাজের বর্ণবৈষম্য আজকের সমাজে অগ্রগতির পথে যে বড় বাধা, যুক্তি দিয়ে তা দেখাও।

৩। অর্থ লেখো ঃ

ঠুলি, পিঁড়ি, ঘানি, বিলক্ষণ, অশুচি, অন্ত্যজ, পত্তন, স্মার্ত।

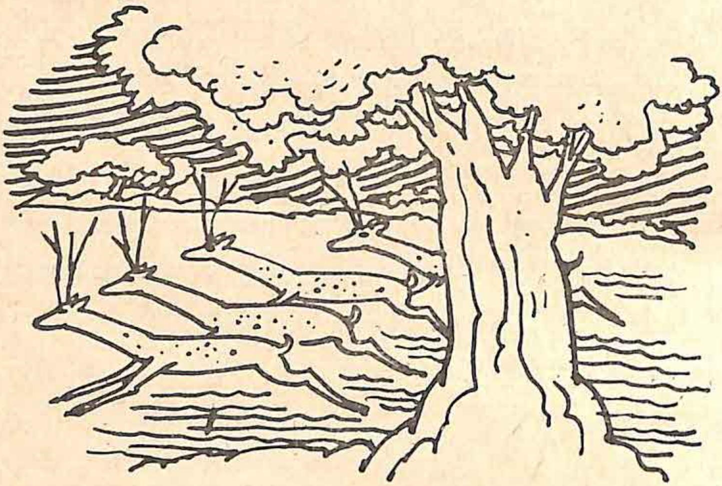
৪। বাক্য রচনা করো ঃ

যন্ত্র, স্বতন্ত্র, মর্যাদা, অর্জন, অশুদ্ধ, আদান-প্রদান।

ঘুম

সমর সেন

ঝোড়ো রাতে কালো ঘুমে
জলপ্রপাতের অবিশ্রাম ধ্বনি,
পোলের উপরে ট্রেন যাওয়ার ধ্বনি।
বিষণ্ণ গানের কলি, সচকিত,
ভীত হরিণের দল
এক একবার তন্দ্রা ভাঙে।



আবার গভীর ঘুমে মনে হয়
আদিম পুরুষ দুর্গম পাহাড়ে ফেরে,
মনে হয় দুচোখে আগুন জ্বেলে
ঘন বনে সাপ খোঁজে হারানো মণি।

অনুশীলনী

১। এই কবিতায় যে ছবিটি ফুটে উঠেছে, নিজের কথায় তা বর্ণনা করো।

২। 'সাপ খোঁজে হারানো মণি'—এর ভেতর দিয়ে কবির মনের কী ভাব ফুটে উঠেছে?

৩। পদ্যে লেখা অন্যান্য কবিতার সঙ্গে এ কবিতার কোথায় তফাত?

৪। 'কালো ঘুম', 'বিষণ্ণ গানের কলি'—ঘুরিয়ে বলবার এই ধরন-গুলোকে কী বলে? এ রকম আরও দু-চারটি বলবার ধরনের নমুনা দাও।

সংস্কৃত এবং বাংলা

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

জননী হইতে যেমন কন্যা জন্মগ্রহণ করে, সেইরূপ সংস্কৃত হইতে বাংলা জন্মিয়াছে এইরূপ মত কেহই পোষণ করিতে পারেন না, কারণ ভাষাপ্রবাহের মধ্যে আমরা বাংলার পূর্বে অপভ্রংশ, তাহার পূর্বে প্রাকৃত যুগ দেখি। সংস্কৃত প্রাকৃত যুগের সমসাময়িক একটি সাহিত্যিক ভাষা। পতঞ্জলির কথিত শিষ্ট বা ব্রাহ্মণ্য সমাজে ইহার প্রচার থাকিলেও ব্রাত্য বা জনসাধারণের মধ্যে যে ইহার ব্যবহার ছিল না, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

সুতরাং সংস্কৃত যুগ বলিয়া আমরা একটি পৃথক যুগ কল্পনা করিতে পারি না। প্রাকৃতের পূর্বে প্রাচীন প্রাকৃতের যুগ, যাহার সাহিত্যিক রূপ আমরা পালি ভাষায় দেখি। প্রাচীন প্রাকৃতের পূর্বে প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার যুগ। এই কালের ব্রাহ্মণ্য সমাজের বহির্ভূত জনসাধারণের কথ্য ভাষাকে আদিম প্রাকৃত বলা হইয়াছে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, সংস্কৃতের সহিত বাংলার কোনও সাক্ষাৎ সম্পর্ক নাই। আমরা কয়েকটি সাধারণ প্রচলিত শব্দের দ্বারা ইহার উদাহরণ দিব।

বাপ, মা, বোন, গরু, নাক, হাত, পা, গাছ, দেখে, শুনে — এই বাংলা শব্দগুলি সংস্কৃত পিতা, মাতা, ভগিনী, গো, নাসিকা, হস্ত, পদ, বৃক্ষ, পশ্যতি, শৃনোতি শব্দ হইতে সাক্ষাৎভাবে ব্যুৎপন্ন হইতে পারে না। ইহাদের প্রাকৃতরূপ যথাক্রমে বপ্প, মাআ, বহিনী, গোরুঅ, নক্ক, হস্স, পাঅ, গচ্ছ, দেখ্খই, সুনই।

স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে এই প্রাকৃত শব্দগুলির বিকারে বা ক্রমশঃ পরিবর্তনে আমরা তাহা পাইয়াছি। একটি সাধারণ বাংলা

বাক্য হইতে আমরা দেখাইব যে, সংস্কৃত হইতে কোন ক্রমেই সাক্ষাৎভাবে বাংলা উৎপন্ন নহে।

বাংলা — 'তুমি আছ' ; সংস্কৃতে, 'যূয়ং স্থ' কিন্তু প্রাচীন প্রাকৃতে (পালি) তুম্হে অচ্ছথ ; মধ্য প্রাকৃতে ও অপভ্রংশ তুম্হে অচ্ছহ ; প্রাচীন বাংলায় তুমহে আছহ। মধ্য বাংলায় তোহ্মে বা তুহ্মি আছহ ; আধুনিক বাংলায় 'তুমি আছ'। ইহা হইতে প্রাচীন ভারতীয় আর্য বা আদিম প্রাকৃত 'তুম্মে অচ্ছথ' পুনর্গঠিত করা যায়।

আমরা আদিম প্রাকৃত হইতে বাংলা পর্যন্ত কয়েকটি স্তর দেখিলাম। সুতরাং 'তুমি আছ' কিছুতেই সংস্কৃত 'যূয়ং স্থ' হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না। যাহা বলা হইল তাহা হইতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, বাংলা সংস্কৃতের দুহিতা নহে তবে দূরসম্পর্কীয়া আত্মীয়া বটে।

যদিও আদিম প্রাকৃত ও সংস্কৃত এক নহে, তথাপি আদিম প্রাকৃতের অনেক শব্দ সংস্কৃতে প্রবেশ করিয়া প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার শব্দ দূরীকৃত করিয়াছে। 'অশ্ব' প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা কিন্তু 'ঘোটক' আদিম প্রাকৃত। ইহা হইতেই বাংলা প্রভৃতি নব্য-ভারতীয় আর্য বা দেশী ভাষায় 'ঘোড়া' হইয়াছে।

অনুশীলনী

১। বাংলা সংস্কৃতের দুহিতা নয়, দূর সম্পর্কের আত্মীয়া — লেখক কি ভাবে এই মত প্রতিষ্ঠিত করেছেন দেখাও।

২। 'তুমি আছ' — এই বাংলা কথাটা কিভাবে বিবর্তিত হয়েছে, লেখকের দৃষ্টান্ত অনুযায়ী দেখাও।

৩। অর্থ লেখো :

অপভ্রংশ, প্রাকৃত, সাক্ষাৎভাবে, স্তর, নব্য, দুহিতা।

৪। পদ-পরিবর্তন করো :

পোষণ, ব্যবহার, সম্পর্ক, বিকার, উৎপন্ন, স্পষ্ট।

সরস্বতী

বুদ্ধদেব বসু



লক্ষ্মী দেবী ভালোমানুষ
অসংখ্য তাঁর ভক্ত,
সরস্বতীর খামখেয়ালে
নাগাল পাওয়া শক্ত।
পুজো তাঁকে করতে হবে
সপ্তাহে সাত দিনই,

তাই ব'লে যে তুষ্ট হবেন
তেমন তো নন ইনি।
সন্ধ্যে, সকাল, রাত-দুপুরেও
সাধতে হবে তোমায়,
কোনোমতেই সইবে না তাঁর
একটি বেলা কামাই,
কিন্তু যদি চিন্তা করো—
মিটল মনোবাঞ্ছা ?
দেখবে তখন আরো অনেক
দূরে তোমার প্রাণ চায়।
হঠাৎ যদি একটি কোনো
বর দিয়ে দেন দৈবে,
ভেব না সেই ভাগ্য তোমার
চিরটা কাল রইবে।

অনুশীলনী

১। সরস্বতীকে নিয়ে কেন মুশকিল ?

২। লক্ষ্মীর যিনি ভক্ত আর সরস্বতীর যিনি ভক্ত — তাঁরা কে কী চান ?

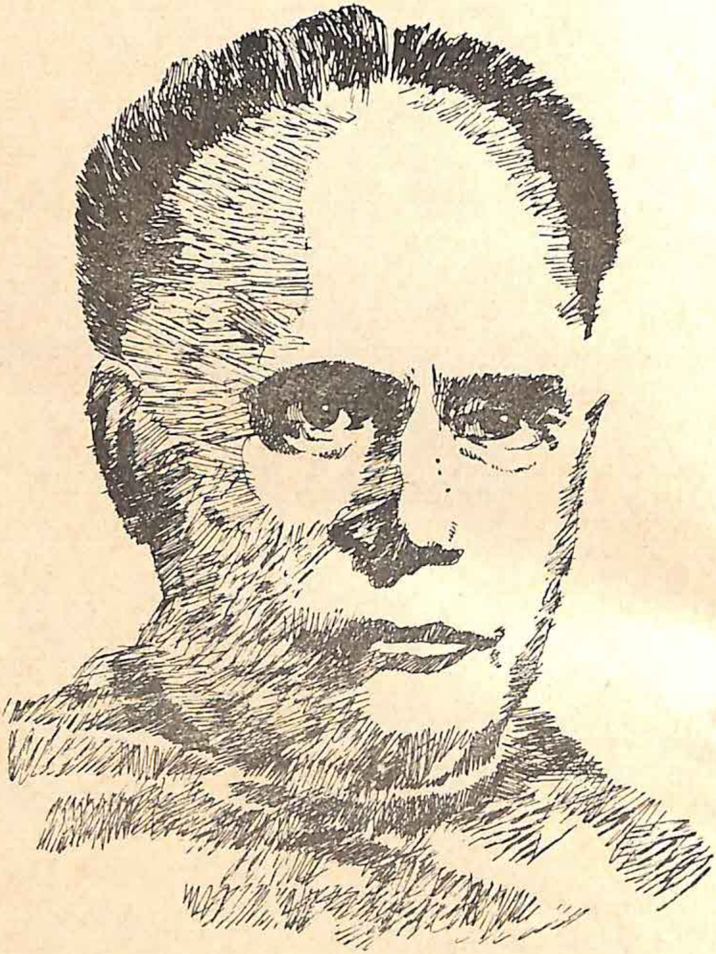
৩। প্রথম আট লাইন মুখস্থ লেখো।

৪। এই কবিতার কোন্ দুটি অন্ত্যমিলে চমক আছে ? নিচের দু-লাইন ছড়ায় মিল দাও ঃ

মেলায় গিয়ে কিনবে গামছা
খুকুমণির ——।

সঞ্চয়ী

ইন্দ্র মিত্র



সামান্য একটু দড়ি কিম্বা কাগজের একটা টুকরো পর্যন্ত বিদ্যাসাগর নষ্ট হতে দেননি। হয়তো কোনো জিনিস কিনে এনেছেন, তার মোড়কের কাগজ আর দড়ি যত্ন ক'রে কুড়িয়ে রেখেছেন।

বিদ্যাসাগরের বড় মেয়ের নাম হেমলতা। তাঁর দুই ছেলে—সুরেশ আর যতীশ। দাদামশায়ের দড়ি আর কাগজের টুকরো কুড়োনো দেখে দু'ভাই হাসাহাসি করত।

একদিন রাত্রে বিদ্যাসাগর শুয়ে পড়েছেন। কী একটা কাজে যতীশের এক টুকরো দড়ির দরকার হল। এত রাত্রে দাদামশায়ের আলমারি ছাড়া দড়ির টুকরো আর কোথায় পাওয়া যাবে? যতীশ চুপে-চুপে দাদামশায়ের ঘরে ঢুকল। চুপে-চুপে আলমারির উপর হাত দিল। হাত দিতে-না-দিতেই বিদ্যাসাগর জিজ্ঞেস ক'রে উঠলেন—ওখানে কে রে?

ভয়ে চুপ ক'রে রইল যতীশ। আবার বিদ্যাসাগর জিজ্ঞেস করলেন—ওখানে কে?

—আমি যতি।

—অন্ধকারে কী করছিস?

—একটু দড়ি নেব।

—এত রাত্রে কেন?

বিদ্যাসাগর উঠলেন। বললেন—থাম, আমি দিচ্ছি। দাদা!—যখন বুড়ো দড়ি কুড়িয়ে রাখে তখন ভাবো দাদামশাই কী বোকা। কেবল ছেঁড়া দড়ি আর ছেঁড়া কাগজ কুড়িয়ে মরে! আর এখন চুপে-চুপে সেই ছেঁড়া দড়ি সরাতে এসেছ! বুড়ো কুড়িয়ে না রাখলে এখন এত রাতে দড়ি কোথায় পেতে বলো তো?

*

আরেকদিন বিদ্যাসাগরের চোখে পড়ল বাড়ির ঝি বাটনা বাটতে বাটতে শিল-ধোয়া হলুদের জলটুকু ফেলে দিচ্ছে। সঙ্গে-সঙ্গে বিদ্যাসাগর বললেন—বলি ও কি হল? হলুদের জলটুকু ফেলে দিলে?

ঝি অবাক হয়ে বলল—দাদামশায়ের কত টাকা যাচ্ছে, সেদিকে নজর নেই, আর এই হলুদের জলটুকুতে চোখ পড়েছে।

বিদ্যাসাগর বললেন—দ্যাখো, হলুদের জলটুকু তরকারিতে দিলে কাজে লাগত। আমি তো আর টাকা জলে ফেলে দিই না, লোককে দিই। ওই হলুদের জলটুকু নষ্ট হবে কেন ?

আসল কথা, কিছুই নষ্ট হতে দিতে চাননি বিদ্যাসাগর।

*

একবার চন্দননগর থেকে কলকাতায় আসছেন বিদ্যাসাগর, সঙ্গে ক্ষুদিরাম বসু আছেন। হাওড়া স্টেশনে নেমে দেখা গেল, খুব ভিড়। বাদুড়বাগানে যেতে হবে। গাড়োয়ান গাড়ি ভাড়া দেড় টাকা চাইল। ভিড়ের মধ্যেই গাড়ির জন্য দর কষাকষি হচ্ছে, এমন সময় বিদ্যাসাগরকে আর দেখা গেল না। ভিড়ের মধ্যে কোথায় যে বিদ্যাসাগর হারিয়ে গেলেন, ক্ষুদিরাম তাঁকে খুঁজে পেলেন না।

অগত্যা ক্ষুদিরাম বাদুড়বাগানে চলে এলেন। বিদ্যাসাগর বাদুড়-বাগানে হাজির। বিদ্যাসাগর ক্ষুদিরামকে বললেন— তুমি যে আসবে তা আমি জানতাম। কি জানি যখন দেড় টাকা ভাড়া চাইতে লাগল, তোমাকে কিছু না বলে আমি আস্তে আস্তে সরে পড়লাম। পুলটা পার হয়ে এসে ছ' আনা পয়সা দিয়ে একখানা গাড়ি ভাড়া ক'রে বাদুড়বাগানে চলে এলাম।

*

কোথাও যাবেন বলে বিদ্যাসাগর একবার বাড়ি থেকে বেরিয়েছেন। শেয়ালদা স্টেশনে গেলেন, ট্রেন না পেয়ে আবার বাড়িতে ফিরে এলেন। স্টেশনে যেতে আসতে দশ আনা গাড়ি ভাড়া গেল। বাড়িতে ফিরে এসে দুঃখ ক'রে বললেন— এই দশ আনা মিছিমিছি গেল।

কাছাকাছি যাঁরা ছিলেন, বিদ্যাসাগরের কথায় তাঁরা হেসে উঠলেন।

— হাসছ কেন ?

কে একজন বললেন — এমন কত দশ আনা যাচ্ছে।

— এইরকম অপব্যয় ?

— কেন, কত লোক আপনাকে ঠকিয়ে কত টাকা নিয়ে যাচ্ছে।

সরল ভঙ্গিতে বিদ্যাসাগর উত্তর দিলেন — তাকে বুঝি অপব্যয় বলে ? সে তো একজনকে হাতে তুলে দিলাম, আর কিছু না হোক, যে পেলে সে উপকার বোধ করল তো ? আর 'ন দেবায় ন ধর্মায়' যে পেল, সে তার পারিশ্রমিক বলে নিল। আর আমি দিলাম বটে, কিন্তু আমার কোনো উপকারে এল না।

অনুশীলনী

১। এমন দু-একটি কাহিনী লেখো যাতে বিদ্যাসাগরের সঞ্চয়ী প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়।

২। সঞ্চয়ী আর কৃপণের মধ্যে তফাত কোথায় ?

৩। অর্থ লেখো ঃ

মোড়ক, গাড়োয়ান, হাজির, অপব্যয়, ন দেবায় ন ধর্মায়।

৪। নিচের জটিল বাক্যটিতে কোন্‌টি কোন্ পদ এবং বিশেষ্যগুলির কোন্ কারক লেখো ঃ

'একবার চন্দননগর থেকে কলকাতায় আসছেন বিদ্যাসাগর, সঙ্গে ক্ষুদিরাম বসু আছেন।'

অন্নদাতা

অমিয় চক্রবর্তী

(১৯০১-১৯৮৬): জন্ম—শ্রীরামপুর, হুগলী। পিতা দ্বিজেশ। প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে পাস ক'রে লণ্ডনে ডক্টরেট পান। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের একান্ত সচিব ছিলেন, পরে আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। 'ঘরে ফেরার দিন' কাব্যগ্রন্থের জন্য আকাদেমি পুরস্কার পান।

পাথরে মোড়ানো হৃদয় নগর
জন্মে না কিছু অন্ন —
এখানে তোমরা আসবে কিসের জন্য ?
বেচাকেনা আর লাভের খাতায়
এখানে জমানো রক্তপণ্য —
যারা দান দেয় তারা মুনাফায়
সাধুতার সুদ কষে তবে হয় দাতা,
নয়তো তারাও রাষ্ট্রচাকায় পিষ্ট, দরদী নাগর
তাদের দেওয়ায় ফলাবে না ধান শান-বাঁধা কলকাতা।
আসো যদি তবে শাবল হাতুড়ি
আনো ভাঙ্‌বার যন্ত্র,
নূতন চাষের মন্ত্র।
গ্রামে যাও, গ্রামে যাও,
এক লাখ হয়ে মাঠে নদী ধারে
অন্ন বাঁচাও, পরে সারে সারে
চাবে না অন্ন, আনবে অন্ন ভেঙে এ দৈত্যপুরী,

তোমরা অন্নদাতা।
জয় করো এই শান-বাঁধা কলকাতা॥

অনুশীলনী

১। অন্নদাতা বলতে কবি কাদের বোঝাচ্ছেন?

২। 'এখানে তোমরা আসবে কিসের জন্য?'—
'এখানে' কোন্ জায়গা? সেখানে 'দাতা' কারা? যদি আসতেই হয়, তাহলে 'ভাঙবার যন্ত্র' আনতে বলেছেন কেন?

৩। অন্নদাতাদের প্রতি কবির কী উপদেশ? 'জয় করো এই শান-বাঁধা কলকাতা'— এর গূঢ় অর্থ কী?

পোখরানের পরীক্ষা

এণাক্ষী ও শান্তিময় চট্টোপাধ্যায়

শ্রীমতী এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায় ইংরেজি সাহিত্যে এম্ এ পাস ক'রে অধ্যাপনা করেন। ডঃ শান্তিময় চট্টোপাধ্যায় এম্ এস্ সি, পি· আর· এস্, ডি· ফিল· পরমাণু বিজ্ঞান গবেষণায় নিযুক্ত ছিলেন।

১৯৭৪ সালের ১৮ই মে ভারতীয় স্ট্যাণ্ডার্ড টাইম সকাল আটটা পাঁচ মিনিটে রাজস্থানের মরুভূমি অঞ্চল পোখরানের মাটির তলায় ভারতের প্রথম পারমাণবিক পরীক্ষা ঘটানো হয়। বাতাস তখন বইছে পশ্চিম-দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে, ঘণ্টায় কুড়ি কিলোমিটার বেগে। ছ-তিন ঘণ্টার মধ্যে বাতাসের বেগ বা দিক পরিবর্তনের কোন সম্ভাবনা নেই, তার পরের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কোন ঝড়েরও সম্ভাবনা ছিল না। আকাশ পরিষ্কার। জনসাধারণের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা ক'রে এতগুলি দিক দেখেশুনে তবেই বিস্ফোরণের সময় ও স্থান ঠিক করা হয়। যদি হঠাৎ তেজস্ক্রিয়তা বাইরে এসে পড়ে (যদিও তার কোন সম্ভাবনা ছিল না) এবং তেজস্ক্রিয় মেঘ গঠিত হয় তাহলে সেগুলো জনবসতিহীন অঞ্চলের দিকে চলে যাবে এবং লোকালয়ে পোঁছুতে পোঁছুতে তেজস্ক্রিয়তার পরিমাণ বিপদ্-সীমার অনেক নিচে চলে যাবে। জায়গাটা এইসব নানা দিক দেখেশুনে বাছা হয়েছিল। অকুস্থলের খুব কাছ থেকে আরম্ভ ক'রে অনেকগুলি আবহাওয়া কেন্দ্র তৎপর ছিল। তারা নিরাপদ সঙ্কেত দেবার পরই পরীক্ষাটি সম্পন্ন করা হয়।

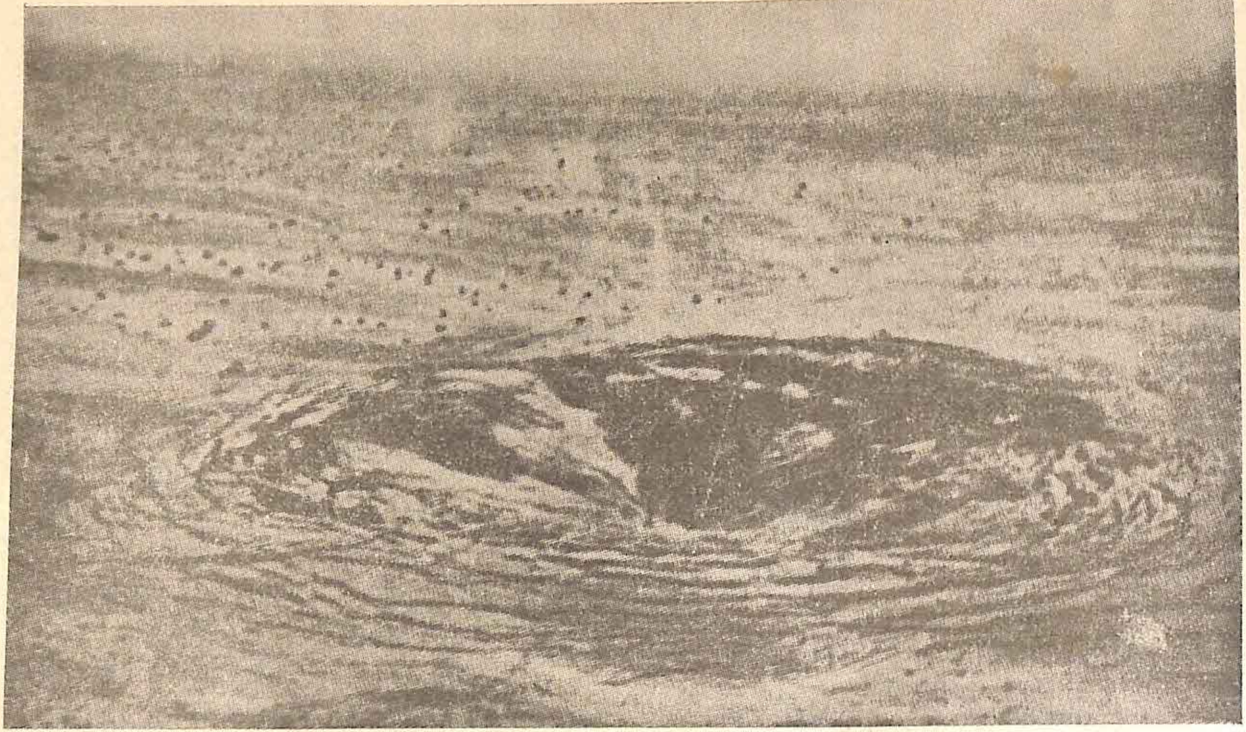
বিস্ফোরকটি ছিল প্লুটোনিয়ম। ইংরেজি L অক্ষরের আকারে কাটা গর্তে তা মাটির এক শো সাত মিটার নিচে একটি পাত্রে সযত্নে

আঁটা অবস্থায় রাখা, যাতে ভেতরে ধুলোবালি প্রবেশ না করতে পারে। তারপরে ছ মিটার অবধি গর্তটি বালির বস্তা ও কংক্রিটের ব্লক দিয়ে ভর্তি করা হয়।

পরীক্ষার আগে ও পরে মাটিতে অথবা হাওয়ার তেজস্ক্রিয়তার কোন চিহ্নই পাওয়া যায় নি। অর্থাৎ বিস্ফোরণের ফলে কোনো তেজস্ক্রিয় রশ্মি বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে নি। কাছেই অল্প দূরে হেল্‌থ-ফিজিক্স-এর ল্যাবরেটরি বসানো হয়েছিল, যাতে জল, মাটি বা গাছপালায় তেজস্ক্রিয়তা ঢুকে থাকলে মুহূর্তের মধ্যে তা ধরা পড়ে। পরেও ক্রমাগত পরীক্ষা ক'রে দেখা হয়েছে— কোথাও তেজস্ক্রিয়তার কোনো চিহ্ন পাওয়া যায় নি।

বিস্ফোরণের ঠিক তিরিশ মিনিট পরে স্বাস্থ্য-পদার্থবিদ্‌দের একটি দল জিপে ক'রে ক্রেটারের মুখের একশো পঁয়ত্রিশ মিটার কাছ অবধি যন্ত্রপাতি নিয়ে পৌঁছে গেলেন — অবশ্য তাঁরা নিজেরা যথেষ্ট সাবধান হয়ে ঢাকাঢুকি দিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁরা ফিরে এসে ঘোষণা করলেন জায়গাটি সম্পূর্ণরূপে তেজস্ক্রিয়তা থেকে মুক্ত। তবে তাঁরা মাটিতে ফাটল দেখলেন। সেখানে যাতায়াত বারণ ক'রে দেওয়া হল। ইতিমধ্যে হেলিকপটারে ক'রে পরীক্ষারত পর্যবেক্ষক দলের কাছ থেকে রেডিও মারফত খবর পাওয়া গেল যে, তেজস্ক্রিয়তার মাত্রায় কোনো পরিবর্তন দেখা যায় নি। দক্ষিণ দিকে পর্যবেক্ষক দল পাঠানো হল এবং দশটার মধ্যে সমস্ত জায়গাটি লোক চলাচলের জন্যে খুলে দেওয়া হয়।

স্বাস্থ্য-পদার্থবিদ্‌রা পরের দিন আবার পরীক্ষাস্থলে গেলেন — এবারে মাটি ও পাথর নিয়ে বিশ্লেষণ ক'রে দেখা হল। তাঁরা যে ফিল্ম-ব্যাজ পরে ছিলেন তাতেও কোনো তেজস্ক্রিয়তা ধরা পড়ল না। বাতাসের গতিপথ অনুযায়ী দক্ষিণের নানা স্থানে, বিশেষ ক'রে — জয়পুর বিকানীর দিল্লী প্রভৃতি জায়গার দুধ খাদ্য হাওয়া বিশ্লেষণ



পোখরানে পরীক্ষার পর

করা হল ; দিল্লী-জয়পুর-আমেদাবাদ এবং দিল্লি-বোম্বাই লাইনের বিমানের ডানা থেকে ধুলো নিয়ে পরীক্ষা ক'রে দেখা হল — কোথাও তেজস্ক্রিয়তার চিহ্ন পাওয়া গেল না। প্রমাণ হল যে, এই পরীক্ষায় একটুও তেজস্ক্রিয় বিকিরণ মাটির বাইরে এসে পেঁ ৗছয় নি।

বিস্ফোরণের ফলে ১০ মিটার গভীর এবং ৪৭ মিটার ব্যাসার্ধের একটি গর্ত দেখা দিল।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের প্রয়োজনের ধরনও বদলায়। ক্রমশই সকলে বুঝতে পারছি, রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে পরমাণু-শক্তির ভূমিকা গৌণ হয়ে পড়ছে ; তার চেয়ে অনেক বেশি জরুরী হল, যেখানে অন্য উপায় খাটে না এমন সব কাজে পরমাণু-শক্তির ব্যবহার।

মাটির নিচে পারমাণবিক বিস্ফোরণ হল রাসায়নিক বিস্ফোরণের বিকল্প। খনন কাজে, বিশেষ ক'রে ভূগর্ভস্থ স্তর থেকে পেট্রোলিয়ম বার করতে, বা খাল খুঁড়তে, অথবা বন্দরের নাব্যতা বাড়াতে এর উপযোগিতা খুব বেশি। এগুলি অন্য বিস্ফোরকের চেয়ে ব্যবহার করতে সুবিধাজনক এবং এর খরচও কম।

ভিয়েনাতে এই নিয়ে ১৯৭০ সাল থেকে ১৯৭৫ সালের মধ্যে আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থার বেশ কয়েকবার বৈঠক বসেছে। ভারত এই সভার সদস্য। সেখানে বিভিন্ন দেশ তাদের নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী পরিকল্পনার কথা আলোচনা করেছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন চায় তার কিছু নদীর জল কাস্পিয়ান সাগরের দিকে প্রবাহিত করতে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রয়োজন ভূগর্ভের গ্যাস ও তেলের সঞ্চয় ওপরে তোলা। ভারতের মত বৃহৎ দেশে নানারকম উপায়ে এই শক্তি কাজে লাগানো যায় — এক নদীর সঙ্গে আর এক নদীকে যুক্ত করতে, বন্দরের সমুদ্রতল গভীর করতে অথবা জলহীন অঞ্চলে জলাধার তৈরি করতে। এখন মাত্র প্রাথমিক অবস্থা — এদিকে অনেক সমীক্ষা দরকার।

অনুশীলনী

১। পোখরানে ভারতের প্রথম পারমাণবিক পরীক্ষার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

২। পরমাণু শক্তিকে কিভাবে মানুষের জীবনে সৃজনের কাজে লাগানো যায়?

৩। অর্থ লেখো:

তেজস্ক্রিয়তা, অকুস্থল, নাব্যতা, পর্যবেক্ষণ, বিপদ্সীমা, সমীক্ষা।

৪। বাক্য রচনা করো:

বিস্ফোরণ, ফাটল, বিকিরণ, গৌণ, উপযোগিতা, জলাধার।

৫। পরমাণুশক্তির আবিষ্কারের সঙ্গে আগুন আবিষ্কারের তুলনা করা যায় কী দিক্ থেকে?

স্বাধীনতা

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

স্মরণ করি তোমাদের
যারা ফাঁসির রজ্জুকে মনে করেছ কণ্ঠলগ্ন কোমল ফুলমালা
মৃত্যুতে দেখেছ অমরত্বের রাজধানী।
স্মরণ করি তোমাদের
নাগ-নক্ষত্রে যাদের যাত্রা,
যারা কারাকক্ষে নিয়তিনির্দিষ্ট হয়ে
যাপন করেছ অবিচ্ছেদ্য অন্ধকার,
আকাঙ্ক্ষার অগ্নিতেজে তপ্ত রেখেছ বক্ষঃস্থল,
জতুগৃহদাহে দেখেছ ইন্দ্রপ্রস্থের নির্মিতি।
আর তোমাদের স্মরণ করি,
সেই সব অগণন নামহীন পথিক পদাতিকের দল,
নির্বিশঙ্ক জীবনের আহ্বানে
পদে-পদে রক্তচিহ্নিত করেছ পথ-প্রান্তর-জনপদ,
ঘরে ঘরে জ্বেলেছ
জায়া-জননীর হাহাকারের দাবাগ্নি।
যাতে আমি জীবনে পেতে পারি মর্যাদা
অমূল্য মূল্যবোধ।
যাতে হাতে পেতে পারি তেজিষ্ঠ লেখনী
কণ্ঠে পেতে পারি দুর্বার কলস্বন
আর প্রকাশ্য গৃহচূড়ে এই অপ্রকম্প পতাকা॥

অনুশীলনী

১। এই কবিতাংশে কাদের স্মরণ করা হয়েছে ?

২। কবিতাটি যথাযথ উচ্চারণে আবৃত্তি করো।

৩। অর্থ লেখো :

রজ্জু, নাগ-নক্ষত্র, জতুগৃহদাহ, তেজিষ্ঠ, দাবাগ্নি, জায়া, কলস্বন।

৪। সমাস ভেঙে লেখো :

কণ্ঠলগ্ন, ফুলমালা, বক্ষঃস্থল, রক্তচিহ্নিত, নিয়তিনির্দিষ্ট।

কন্দর্প

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

আমার বাড়ির সামনে দিনের বেলায় আলো, দীঘির জল, খালের পাড় — সব কিছু ঝলমল করে। রাতের বেলায় সেই একই জায়গা নিঝুম হয়ে যায়। খানিক দূর দিয়ে ইলেকট্রিক ট্রেন যায় ঝমঝম ক'রে। রাতে ডিস্ট্যাণ্ট সিগনাল একা রেললাইন পাহারা দেয়।

আমাদের বাড়ির সামনের খালপাড় দিয়ে গাঁয়ের ভেতরে যাওয়ার রাস্তা। এখানে শহরের ভাব আছে। গাঁয়ের ভাব আছে। সারের দোকান আছে। সিনেমা হলও আছে। বারান্দায় বসে দেখি চব্বিশ বছরের একজন তাগড়াই জোয়ান প্রায়ই ভোরবেলা গাইতে গাইতে যায়। আবার বিকেলের দিকে গাইতে গাইতে ফেরে। কোথাও কাজ করে বোধ হয়।

একদিন সকালে দু'জন মিস্ত্রি, দু'জন যোগাড়ে আমার ঘুম ভাঙালো। কি কাজ আছে বাবু? খবর দিয়েছেন তাই এলাম। ওদের হাতে কর্নিক, দাগরাজি করার কাঠের পাটা। সঙ্গে টিফিনের কৌটো। বুঝলাম, কাজ আছে শুনে তৈরি হয়েই এসেছে। কিন্তু সত্যিই তো কোন কাজ নেই। বললাম, কে খবর দিল তোমাদের? কোন কাজ নেই তো।

মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে ফিরে যাবার সময় বলে গেল, এ বাবু গণেশের কাণ্ড। এমন বানিয়ে বানিয়ে বলল — বিশ্বাস না ক'রে উপায় নেই। আপনার নাকি চৌবাচ্চার কাজ হবে—

গণেশ আর কেউ নয়। যে রোজ সকালবেলার বাতাসের সঙ্গে গান গাইতে গাইতে কাজে যায়, সে এই গুণধর। আবিষ্কার করতে দেরি হল না। একদিন বিকেলে থামালাম ওকে। ঘরে ফিরছিল।

বললাম, তুমি এত সুন্দর দেখতে। কিন্তু এত মিথ্যে কথা বল কেন ?

আমার কথার গোড়ার দিকটাই ও শুধু নিল। বাকিটুকু গ্রাহ্যই করল না। তদনুযায়ী খুব লাজুক মুখ ক'রে দাঁড়াল। সুঠাম চেহারা। গায়ে একটুও বাড়তি মেদ নেই কোথাও। নিজেই বলল, আগে আরও সুন্দর দেখতে ছিলাম বাবু। এখন তো বিশেষ খেতে



পাইনে। আরও অনেক কিছু জানালো। যাত্রাদলে ছিল। বাইরে ডাক আসতো। কপাল খারাপ। তাই সে কাজ হারিয়েছে। কথা বলছিল আর আটকে যাচ্ছিল। বললাম, যখন গাও গলা তো আটকায় না—কিন্তু কথা বললেই জিভ জড়িয়ে যায় ?

আমার কপাল মন্দ বাবু।

কেন ?

একবার নদীর ওপারে অভিমন্যু পালা গেয়েছিলাম বাবু। সেখানে ধন্য ধন্য পড়ে গেল। বাদা অঞ্চল। সবাই আমাকে দেখতে এসেছিল। খেতে দিয়েছে থালা ভরে। লাট এলাকার কুকুরগুলো বড় মন্দ হয়। বড় জ্বালাচ্ছিল। যেই জিভ বের ক'রে

ভেঙিয়েছি— অমনি লাফ দিয়ে এক কামড়ে আমার জিভের ডগাটা কেটে নেয়।

তারপর ?

ছুট ছুট। কুকুরের মুখ ফাঁক ক'রে জিভের ডগা পাওয়া গেল। খেয়েই ফেলতো আরেকটু হলে। টুকরোটা হাতে নিয়ে নদীর পাড়ে ডাক্তারবাবুর দোকানে ছুটলাম। ভাগ্যিস বাড়ি ছিলেন। ঘোড়ার বালামচি দিয়ে সেলাই ক'রে জুড়ে দিলেন।

লোকটা সত্যি বলছে না মিথ্যে বলছে! আমার সন্দেহ হচ্ছে জেনেই কিনা জানি না—গণেশ জিভ বের ক'রে রাখল। সত্যি একটা সেলাইয়ের দাগ।

ভেতরে ঢোকাও।

গণেশ জিভ ভেতরে নিয়ে বলল, সেই থেকে বাবু কথা বলতে গেলে গ-গলা আটকে যায়। তবে গান আটকায় না। বুক ভরে গাই। কিন্তু আর ওরা আমায় পালাগানে ডাকে না। গানের সঙ্গে কথা থাকে তো।

অনুশীলনী

১। লেখক তাঁর বাড়ির সামনের যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা থেকে তোমার নিজের কথায় একটা ছবি ফুটিয়ে তোলো।

২। গণেশের জিভ সংক্রান্ত গল্পটা বলো।

৩। অর্থ লেখো :

তাগড়াই, যোগাড়ে, কর্নিক, দাগরাজি, তদনুযায়ী, লাট এলাকা।

৪। বাক্য রচনা করো :

কাঠের পাটা, টিফিনের কৌটো, গ্রাহ্য, বাদা-অঞ্চল, পালাগান।

৫। পদ-পরিবর্তন করো :

সুন্দর, লাজুক, মন্দ, দাগ, কাজ, আবিষ্কার।

পূর্ণিমা

সরোজ দত্ত

বাঁশীতে শিকড়ে, মন্ত্রে আমারে বাঁধিতে চায় যারা
ঝাঁপির গুমোটে রেখে মাঝে মাঝে ভাঙে বিষদাঁত,
গলায় জড়াতে চায়, চুমু খায় সোহাগে গলিয়া,
তাদের জানায়ে দিয়ো এসে গেছে পূর্ণিমার রাত।
ওদের বাঁশীর সাথে মুগ্ধফণা দোলায়েছি কত,
ক্লান্ত হয়ে কতবার বিবর খুঁজেছি নতমুখে,
কতবার বোবা রাগে গর্জে উঠে নিষ্ফল ছোবলে
মাটিতে ভেঙেছি মাথা — ওরা শুধু হেসেছে কৌতুকে।
মজ্জায় মজ্জায় আজ এ আমার কি নিবিড় ব্যথা,
স্পর্শাতুর পিচ্ছিলতা, সারাদেহে যন্ত্রণার জ্বর,
নিষ্পলক দুইচোখ — দুই ফোঁটা হিংসার নির্যাস —
স্খলিত নির্মোক তবু — নবীন, মসৃণ, ভয়ংকর।
খেলার নেশাতে মেতে ওরা কি ভুলিয়া গেল হায়,
আমার বিষের থলি পূর্ণ আজ কানায় কানায়।

অনুশীলনী

১। প্রথম চার লাইন মুখস্থ লেখো।

২। কবিতাটির ভাবার্থ কী ব'লে তোমার মনে হয়?

৩। অর্থ লেখো ঃ

ঝাঁপি, সোহাগ, বিবর, নির্যাস, নির্মোক, মসৃণ।

৪। 'আমার বিষের থলি পূর্ণ আজ কানায় কানায়' — এর মধ্যে কোন ইঙ্গিত নিহিত আছে?

৫। বিপরীতার্থক শব্দ লেখো ঃ

পূর্ণ, বাঁধা, বোবা, নিষ্ফল; যন্ত্রণা, হিংসা।

ভয়ঙ্কর

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

হঠাৎ পিছনে পায়ের শব্দ হল। দেখি, লোকটা এগিয়ে আসছে। '...কোথা যাওয়া হবে হুজুর? কুতুবপুর। ও, বুঝেছি। চৌধুরী বাড়ি যাওয়া হচ্ছে আজ্ঞে। আহা-হা, ওনারা বড্ড ভালো মানুষ। ওনাদের বাড়ি বিয়ে লেগেছে, শুনেছি।...'

লে বাবা! এ যে ত্রিকালদর্শী মহাপুরুষ দেখছি। বিরক্ত হয়ে শুধু 'হুঁ' বলে চলা শুরু করলাম।

লোকটা কিন্তু দমল না। পিছনে তার কণ্ঠস্বর এল, ...'চিনতে পারবেন না হুজুর। গত বর্ষায় ভীষণ বান হয়েছিল কিনা। তাই পথ বলতে যেটুকু ছিল, ধুয়ে মুছে গেছে। চলুন আজ্ঞে! পোঁছে দিয়ে আসি। আহা, চৌধুরীরা বড় ভালো মানুষ।'

এ তো বড় গায়েপড়া লোক দেখছি। বললাম, 'থাক্, আমি পারব'খন। তুমি তোমার কাজ করগে না।'

লোকটা হাসল। 'আমার আবার কাজ হুজুর? ওই ডোবায় দুচারটে কাঁকড়া-গুগলি ধরছিলাম। সে পরে হবে। আহা, ওনারা বড় ভালোমানুষ। ওনাদের কুটুম্ব আপনি। মাঝ মাঠে দিশেহারা হয়ে ঘুরবেন—খরার রোদে পুড়ে মরবেন, সেটা কি হয়?'

গতিক দেখে বললাম, 'ঠিক আছে। তুমি আগে চল। পথ চিনিয়ে হাঁটো।'

লোকটা করজোড়ে বলল, 'আজ্ঞে না। তা কি হয়? আপনি ভদ্দলোক, আমি ছোটলোক। আপনার আগুতে আমি যেতে পারি? ছিঃ, পাপ হবে যে।'

ওর পাপ-পুণ্যের জ্ঞান দেখে আমি অবাক হব কী—বরং ক্রমশঃ

ভীত হয়ে পড়েছি। কী মতলব ওর? সঙ্গে সোনাদানা নতুন কাপড়-চোপড় রয়েছে। সন্দেশ রয়েছে। এই নির্জন মাঠে এমন একটা দৈত্যের মতো লোক। সর্বনাশ! নির্ঘাৎ আমি ঠ্যাঙাড়ের পাল্লায় পড়েছি। পিছন থেকে আচমকা হয়ত আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে গলা টিপে ধরবে। বুক টিপ টিপ করতে থাকল। ভয়ে দু'চোখে সর্ষের ফুল দেখছিলাম। বারবার আড়চোখে পিছনে লক্ষ্য রাখছিলাম। প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছিল এই বুঝি ওর কর্কশ থ্যাবড়া হাতটা গলায় এসে ঠেকল!

লোকটা কিন্তু অনর্গল কথা বলছে। কিছু কানে আসছে, কিছু আসছে না। ভয় মনকে আক্রমণের দুর্ভাবনায় ব্যস্ত রেখেছে। লোকটা সম্ভবতঃ এ এলাকার কবে কোথায় কোন্ ভদ্দরলোকের বাড়ি কি উৎসব হয়েছে, তাই খবর দিচ্ছে। দিক্! আমি তৈরি আছি। অন্তত দু'চারটে নখের আঁচড় না খাইয়ে জিনিস বেহাত করছিনে।

হঠাৎ লোকটা বলল 'এই যে হুজুর—এই গাছটা দেখছেন, কয়েত বেলের গাছ। এটা হলো কিনা নির্বংশতলা। ছায়ায় এট্টুখানি বসবেন আজ্ঞে? বসুন জিরিয়ে নিন। পথ তো এখনও কম নয়।'

নির্বংশতলা শব্দটা তো বটেই, সামনে সেই প্রাচীন গাছ, নির্জনতা, এই রাক্ষুসে চেহারার লোক, আমার কাছে সোনাদানা—সব মিলিয়ে একটা আচম্বিতে বিস্ফোরণ ঘটে গেল এতক্ষণে।

অস্ফুট চিৎকার ক'রে হঠাৎ দিশেহারা চকিত জন্তুর মত সোজা দৌড় দিলাম।

গ্রীষ্মকালের গনগনে রোদ্দুরে খড়ের বন, চষা খেত, আলপগার কাটাঝোঁপ ডিঙিয়ে পরিত্রাহি চিৎকার করছি আর দৌড়াচ্ছি। পিছনে সেই ঠ্যাঙাড়ে মতো লোকটা সমানে আমাকে অনুসরণ করছে আর চেঁচাচ্ছে, 'বাবু, বাবু! ভয় নাই, ভয় নাই।'

মামাতো ভাই-বোনদের ঠাট্টার ভয়ে কথাটা কাকেও অবিশ্যি

বলিনি। ওরা ছেলেবেলা থেকে আমাকে ভীতুদের শিরোমণি বলে ডাকে। এ বয়সে যে লেজ তুলে দৌড়াদৌড়ি করেছি, জানলে ওরা আমাকে উত্ত্যক্ত ক'রে মারবে।

বিয়ের দিন বরযাত্রীদের খাওয়া-দাওয়া চুকতে বিকেল হয়েছে। বাইরের ঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি। ঝি-চাকরেরা এঁটোকাটা নিয়ে গিয়ে প্রাঙ্গণের কোণে ফেলছে। কতকগুলো কুকুর আর কাক সেখানে ঘুরঘুর করছে। হঠাৎ স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। আমার সারা শরীর জুড়ে সাঁৎ ক'রে এক ঝলক রক্ত চলে গেল।

সেই লোকটা! বড় বড় হলুদ দাঁত, খোঁচা খোঁচা দাড়ি-গোঁফ, ঝাঁকড়-মাকড় চুল, আধ ল্যাংট ঢ্যাঙা ভয়ঙ্কর একটা মূর্তি।

মুহূর্তে রাগে আমার চোয়াল আঁটো হয়ে গেল। এখানে আমার চারপাশে অনেক লোক। ইচ্ছে করলেই ওকে পিষে মারতে পারি। ব্যাটা ঠ্যাঙাড়ে অসম্ভব ধূর্তামি ক'রে আমাকে অনুসরণ করেছিল সেদিন। দৌড়ে না পালালে নির্ঘাৎ আমায় খুন করত।

লাফ দিয়ে বারান্দা থেকে নামলাম। তারপর আমাকে দাঁড়াতে হল কিন্তু।

লোকটা হুমড়ি খেয়ে পড়েছে এঁটো পাতাগুলোর ওপর। গোগ্রাসে এঁটো খাবারগুলো গিলছে। এক হাতে কুকুর তাড়াচ্ছে, অন্য হাতে এঁটো পাতা টানছে।···

একেই আমি ভয় পেয়েছিলাম? ধিক আমাকে। গভীর দুঃখ আমাকে অভিভূত করল। আমার সারা শরীর অবশ হয়ে গেল। চারপাশে উৎসবের আনন্দ, প্রচুর সুস্বাদু ভোজ্যবস্তু — আর একটা মানুষ এমনি ক'রে এঁটোপাতার ভিতর কুকুরের সঙ্গে লড়াই করছে! ওকে ভয় করতে নেই। ওর কাছে ভয়ের কিছু নেই।

না! ভুল বলছি।

ভয়ের ব্যাপার ছিল। এবার যে ভয়, তা পৃথিবীর সবচেয়ে

গুরুতর ভয়। সে ভয় ওকে নয়, ওর ক্ষুধাকে। ওই রাক্ষুসে ক্ষুধার কাছে পৃথিবীকে খুব অসহায় মনে হল।

অনুশীলনী

১। যিনি গল্পটি বলছেন ভয় পেয়ে শেষে কেন তিনি ছুট দিলেন, তার বিবরণ নিজের ভাষায় উত্তম পুরুষে লেখো।

২। অর্থ লেখো ঃ

ত্রিকালদর্শী, গায়ে পড়া, খরা, ঠ্যাঙাড়ে, পাল্লায় পড়া, চোখে সর্ষের ফুল দেখা।

৩। বাক্য রচনা করো ঃ

কর্কশ, মতলব, জিরিয়ে নেওয়া, শিরোমণি, ক্রমশ, মহাপুরুষ।

৪। পদ-পরিবর্তন করো ঃ

বিরক্ত, কুটুম্ব, আক্রমণ, রাক্ষুসে, জন্তু, ভীতু।

৫। তোমার জীবনে ভয় পাওয়ার কোনো ঘটনা ঘটে থাকলে গল্প বলার মতো ক'রে লেখো।

আমাদের সেই সঙ্গীটি

শিবনাথ শাস্ত্রী

(১৮৪৭-১৯১৯): জন্ম — চাঙ্গরিপোতা, ২৪ পরগণা। পিতা হরানন্দ ভট্টাচার্য (বিদ্যাসাগর)। এক বছরেই পাঠশালার পাঠ শেষ করেন। বার বছর বয়সে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন। পরে কলকাতার হেয়ার স্কুলে শিক্ষকতা করেন। ব্রাহ্মসমাজের আচার্য ছিলেন। সর্বতোমুখী প্রতিভা ছিল। অসংখ্য প্রবন্ধ ও কবিতা লিখেছেন।

আমাদের তখনকার একজন খেলার সঙ্গীর কথা স্মরণ আছে। সে শেয়ালখাকী। শেয়ালখাকী একটা মাদি কুকুর। তাহার ইতিবৃত্ত এই, আমার বাবা একদিন দেখিলেন একটি কুকুরের বাচ্চাকে শেয়ালে লইয়া যাইতেছে। দেখিয়া তাঁহার দয়ার আবির্ভাব হইল। তিনি হৈ হৈ করাতে ও ঢিলঢেলা মারাতে শেয়ালটা বাচ্চাটাকে ফেলিয়া পলায়ন করিল।

বাবা বাচ্চাটা কুড়াইয়া আনিলেন। সে তখন অতি শিশু, তাহার পৃষ্ঠের শেয়ালের কামড়ের ঘা শুকাইতে অনেক দিন গেল। সে বড় হইল, বাবা তাহার নাম শেয়ালখাকী রাখিলেন। শেয়াল-খাকী আমাদের বাড়িতেই রহিয়া গেল। এবং পাড়ার বালক-বালিকার খেলিবার একটা মস্ত সঙ্গী হইয়া দাঁড়াইল।

এখন আমার ভাবিয়া আশ্চর্য বোধ হয়, আমরা শেয়ালখাকীকে আমাদেরই একজন ভাবিতাম। সে সকল খেলাতেই সঙ্গে থাকিত। আমরা পাড়ার বালক-বালিকাদের সঙ্গে মিশিয়া কখনো কখনো বনভোজনে যাইতাম। পাড়ার নিকট কোন জঙ্গলময় স্থান পরিষ্কার করিয়া সেখানে উনান করিয়া প্রত্যেকের বাড়ি হইতে কাঠ-কুটা চাল-

ডাল বহিয়া লইয়া যাইতাম। বালিকারা রাঁধিত, বালকেরা হইত নিমন্ত্রিত। ব্রাহ্মণ এবং তাহাদের মা-খুড়ী-জেঠীরা হইতেন অতিথি। পরম সুখে বনভোজন হইত।

শেয়ালখাকী আমাদের সঙ্গে সমস্ত দিন বনে থাকিত। আহারান্তে আমরা যখন বনে লুকোচুরি খেলিতাম তখন শেয়ালখাকী বনের মধ্যে লুকাইত। আমরা খুঁজিয়া বাহির করিতাম। আমরা তাহাকে খেলার সঙ্গী বলিয়াই জানিতাম।

শেয়ালখাকীর দুইটি কীর্তি স্মরণ আছে। একবার আমরা কয়েকজন বালকে পরামর্শ করিলাম যে প্রতিবেশীদের একটা পুরাতন ভাঙা দালানে ঢুকিয়া পায়রা ধরিব। ঐ দালানের মধ্যে অনেক পায়রা থাকিত, আমরা মধ্যে মধ্যে ঘরে ঢুকিয়া দ্বার-জানালা বন্ধ করিয়া তাড়া দিয়া পায়রা ধরিতাম।

কিন্তু দ্বার-জানালা ভাঙিয়া তাহাতে এত গর্ত হইয়া গিয়াছিল যে, সেগুলি বন্ধ করিবার জন্য প্রায় পাঁচ-ছয়জন বালককে ঘরে প্রবেশ করিতে হইত। দরজা-জানালার গর্তে গর্তে পিঠ দিয়া এক-একজন বালক দাঁড়াইত। আর একজন পায়রাগুলিকে তাড়াইয়া ধরিত।

সেদিন আমাদের পাঁচজনের মধ্যে চারজন বৈ জুটিল না। আমরা একজন বালক খুঁজিয়া বেড়াইতেছি। এমন সময় দেখি শেয়ালখাকী আসিতেছে, শেয়ালখাকীকে দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। ভাবিলাম আর বালকের প্রয়োজন নাই, শেয়ালখাকীর দ্বারাই কাজ চলিবে।

বলিলাম, 'শেয়ালখাকী! আয় আয় পায়রা ধরিতে যাই।' শেয়ালখাকী অমনি প্রস্তুত। আমাদের সঙ্গে চলিল।

ঘরের ভিতর ঢুকিয়া এক-একজন বালক এক-এক ছিদ্রে পিঠ দিয়া দাঁড়াইল। দ্বারের নিচে চৌকাঠের উপরে একটা ছিদ্র ছিল। শেয়ালখাকীকে বলা গেল, 'শেয়ালখাকী! এই গর্তের মধ্যে লেজ দিয়ে বসে থাক্, দেখিস যেন এ জায়গা ছেড়ে উঠিস নে।'

তখন আশ্চর্যবোধ হয় নাই, এখন যতবার ভাবি আশ্চর্যবোধ হয়। শেয়ালখাকী কি করিয়া আমাদের কথা বুঝিল! সেই ছিদ্রের মধ্যে লেজ দিয়া নিজের পিঠের দ্বারা ছিদ্রটি ঢাকিয়া বসিয়া রহিল।

পরে পায়রাদিগকে যখন তাড়া দিতে আরম্ভ করা গেল এবং পায়রাগুলি তাহার মুখের সম্মুখ দিয়া উড়িয়া যাইতে লাগিল তখন না জানি শেয়ালখাকীর পক্ষে স্থান ত্যাগ করিয়া পায়রার সঙ্গে ছুটিবার কি প্রলোভনই হইয়া থাকিবে! কিন্তু সে তাহা করিল না, আমরা যেরূপ পিঠ দিয়া ছিদ্র ঢাকিয়া স্থির থাকিলাম, সেও সেই প্রকার রহিল।

আর একটি ঘটনা এই: আমাদের বুধী বলিয়া একটি গাভী ছিল। তাহার একটি রাখাল ছিল। শেয়ালখাকী অনেক সময় রাখালের সঙ্গে বুধীকে লইয়া মাঠে যাইত। সমস্ত দিন মাঠে থাকিয়া বৈকালে ঘরে আসিত।

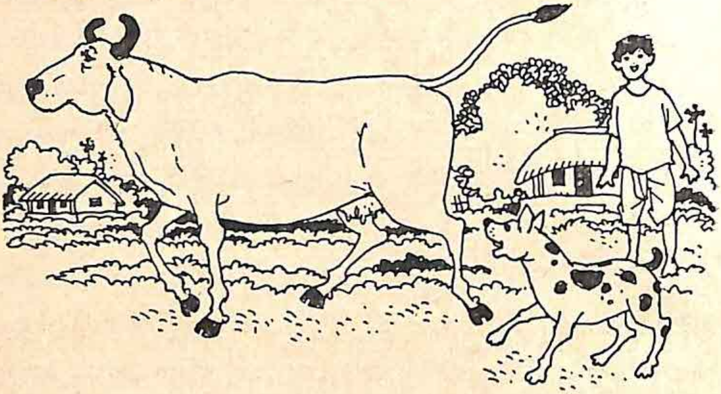
একবার বাবা কি কারণে রাগ করিয়া রাখালটাকে মারিয়া তাড়াইয়া দিলেন। তখন বুধী ঘরে বাঁধা পড়িল, তাহাকে চরায় কে? এইরূপে দুই একদিন গেল। পরে আমি বলিলাম, 'বাবা, শেয়ালখাকীকে দিলে সে গরু চরিয়ে আনতে পারে।'

শুনিয়া বাবা হাসিলেন, 'হ্যাঁ! কুকুরে আবার গরু চরাবে!' মা শেয়ালখাকীকে চিনিতেন। তিনি তখন আমার কথাতে যোগ দিলেন। তখন শেয়ালখাকীর সঙ্গে গরু পাঠানো স্থির হইল।

কেমন করিয়া গরু চরাইতে হবে তাহা শেয়ালখাকীকে বুঝাইয়া দেওয়া হইল। সে গরু লইয়া যাইতে আরম্ভ করিল। একদিন সন্ধ্যা হইয়া গেল, গরু আর আসে না, বাবা ও মা চিন্তিত হইতে লাগিলেন।

অবশেষে দেখা গেল যে, শেয়ালখাকী মহা চিৎকার করিতে করিতে আসিতেছে, সঙ্গে গরু নাই। আসিয়া আমাদের মুখের দিকে চাহিয়া চিৎকার করে, একটু দৌড়াইয়া যায় আবার দাঁড়ায়। আবার

নিকটে ছুটিয়া আসে, মুখের দিকে চায়, ডাকে, আবার দৌড়াইয়া যায়, আবার দাঁড়ায়।



শেষে বাবা বুঝিলেন যে, আমাদিগকে সঙ্গে যাইতে বলিতেছে। তখন আমাদের দুইজন বালককে সঙ্গে যাইতে আদেশ করিলেন। আমরা সঙ্গে গিয়া দেখি, কাহারা আমাদের গরু বাঁধিয়া রাখিয়াছে। তাহারা শেয়ালখাকীকে দেখিয়া বলিল, 'ওরে কুকুরটা আবার এসেছে, নিজে মার খেয়ে গিয়ে বাড়ির লোক ডেকে এনেছে।'

এই শেয়ালখাকীর ন্যায় আরও অনেকবার অনেক কুকুর পুষিয়াছি।

অনুশীলনী

১। 'শেয়ালখাকী' নাম কি ভাবে হল বর্ণনা করো।

২। শেয়ালখাকীর কীর্তি দুটির মধ্যে যেটি তোমার ভালো লাগে সেটি বর্ণনা করো।

৩। পদ পরিবর্তন করো :

স্মরণ, নিয়ন্ত্রিত, আবির্ভাব, সম্মুখ, স্থির, সন্ধ্যা।

৪। চলিত ভাষায় রূপ দাও :

আমরা যেরূপ পিঠ দিয়া ছিদ্র ঢাকিয়া স্থির থাকিলাম, সেও সেই প্রকার রহিল।

দিন ফুরোল

শঙ্খ ঘোষ

(১৯৩৩ -   ) : জন্ম — বহড়ু, ২৪ পরগণা। সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত কবি। অধ্যাপক।

সূয্যি না কি সত্যি নিজের ইচ্ছেয়
ডুব দিয়েছে? সন্ধে হল? তুচ্ছাই!

আকাশ জুড়ে এক্ষুনি এক ঈশ্বর
চম্‌কে দেবেন লক্ষ রঙের দৃশ্যে।



লক্ষ, বা তা হতেও পারে একশো
কেই-বা খুলে দেখছে রঙের বাক্স!

আমরা কি আর দেখতে পাব ভাবছ ?
বাপমায়েরা যাবেই তবে মুচ্ছো !

পাখির সারি যেমন ধানের গুচ্ছে
আঁধার ফেলে ঘরের দিকে উড়ছে

তেমনি এবার ফিরতে হবে সত্যি
নিজের নিজের মন-খারাপের গর্তে।

অনুশীলনী

১। প্রথম ছ লাইন মুখস্থ লেখো।

২। এই কবিতায় সূর্যাস্তের কী কী ছবি ফোটানো হয়েছে ?

৩। এর মজাদার অন্ত্যমিলগুলো খুঁজে বার করো।

৪। মিল দাও :

হ্যাঁচ্চো ______ হুস্থি ______ কণ্ঠী ______ মন্ত্রণা ______ দমদম ______

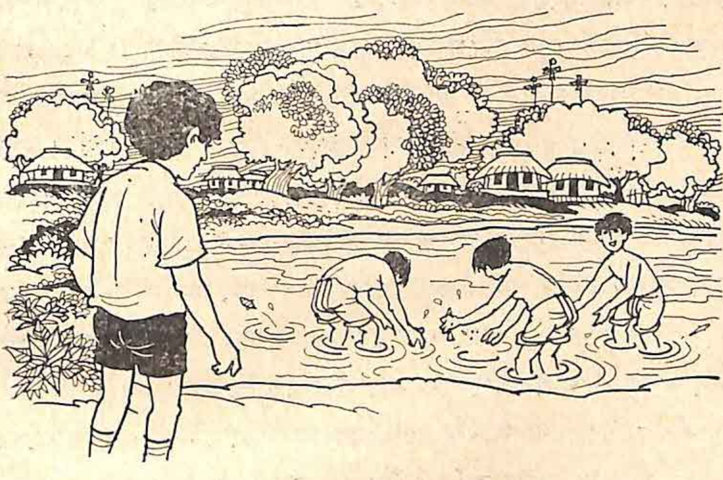
৫। বিপরীতার্থক শব্দ লেখো :

আকাশ, খুলে, আঁধার, ঘর, নিজের।

আমাদের দেশ

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

সুজয়ের দেশ বর্ধমান জেলায়। জন্মাবধি কলকাতায় থাকে, দেশের বাড়িতে কখনো যায় নি। দিদির বিয়ে উপলক্ষ্যে এবারই প্রথম গেল। তার দশ বছরের জীবনে এত আনন্দ সে কখনো পায় নি। কলকাতার পাথর-বাঁধানো রাস্তা আর ইঁটের দেয়াল ছাড়িয়ে দেশটা যেখানে দিব্যি হাত-পা ছড়িয়ে সবুজ চাদরে গা ঢেকে শুয়ে আছে তার সঙ্গে এই প্রথম তার চাক্ষুষ পরিচয় হল। এমন ঘন সবুজ কোনো কালে সে দেখে নি। রেল-লাইনের দুধারে যতদূর চোখ যায় সবুজ ধানের খেত। কচি বাঁশের ঝাড় হাওয়ায় দুলছে।



যা দেখছে তাই ভালো লাগছে। কোথাও হলদে রঙের বুনো ফুল ফুটে আছে; কোথাও বা পুকুরের জলে শালুক ফুল ভাসছে,

পদ্মের মতো দেখতে। সুজয় থেকে থেকে চেঁচিয়ে উঠছে। কখনো মাকে কখনো বাবাকে কখনো বা দিদিকে দেখিয়ে বলছে, বাঃ দেখো দেখো কি সুন্দর! এক জায়গায় সরু একটা খালের হাঁটুজলে একপাল ছেলে মাছ ধরছে। সুজয় হাততালি দিয়ে বলে উঠল, দিদি ওই দেখো—'সকালে বিকালে কভু নাওয়া হলে পরে, আঁচলে ছাঁকিয়া তারা ছোট মাছ ধরে।' ইচ্ছে করছিল তক্ষুনি গাড়ি থেকে নেমে গিয়ে সেও ওদের সঙ্গে মাছ ধরতে লেগে যায়।

ওর আনন্দ দেখে ওর বাবার মনেও খুব আনন্দ হয়েছে। বললেন, কেমন, বলেছিলাম তো কলকাতায় বসে বোঝাই যায় না আমাদের এই দেশ কত সুন্দর আর কত বিরাট। এই তো মোটে কলকাতা থেকে আশি কিলোমিটার দূরে যাচ্ছ তোমার গ্রামের বাড়িতে—বর্ধমান জেলার ছোট একটি গ্রামে। জান, এমন প্রায় পাঁচ লক্ষ গ্রাম আছে সমস্ত ভারতবর্ষে। আর এই যে তোমার বর্ধমান জেলা এরকম গোটা কয়েক জেলা মিলে এই বাংলা। আবার বাংলার মতো বেশ কয়েকটি দেশ মিলে তবে আমাদের ভারতবর্ষ। দেশ না বলে মহাদেশ বললেও চলে—এতই বিরাট এই দেশ। পঞ্চাশ বা একশো কিলোমিটারের ব্যাপার নয়, বেশ কয়েক-হাজার কিলোমিটার ঘুরে দেখলে তবে সমস্ত ভারতবর্ষকে চেনা যায়। বড় হয়ে, গোটা ভারতবর্ষ তুমি ঘুরে দেখবে। তখন বুঝবে এমন সুন্দর দেশ পৃথিবীতে কমই আছে। কত পাহাড়, কত বন, কত নদী, কত শহর, আর সবচাইতে বড় কথা, কত রকমের মানুষ। যতই দেখবে ততই দেশকে আর দেশের মানুষকে ভালোবাসতে শিখবে।

কিন্তু সুজয়ের আনন্দ ওখানেই শেষ হয় নি। এর চাইতেও মজার ব্যাপার ঘটল বাড়ি পৌঁছবার পর। বাড়িতে অনেকগুলো ছেলেমেয়ে, অনেকেই তার সমবয়সী, কেউ দু-এক বছরের বড়, কেউ ছোট। এরা কেউ তার জ্যেঠামশায়ের ছেলে-মেয়ে, কেউ বা

কাকার। এ ছাড়া কেউ এসেছে তার পিসির বাড়ি থেকে, কেউ মামার বাড়ি, মাসির বাড়ি থেকে। এরা সকলেই তার আপনার জন ; তার ভাইবোন। খুড়তুতো, জেঠতুতো, মামাতো, পিসতুতো, মাসতুতো ভাইবোন। এদের আগে কখনো দেখে নি। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সকলের সঙ্গে খুব ভাব জমে গেল। সে ভাবে আর অবাক হয়ে যায়। এরা তার এমন আপনার জন, এদের সে চিনতই না। মোটে তো আট-দশ দিন একসঙ্গে কাটিয়েছিল। বিয়ে চুকে যাবার পরে যখন সবাই যে যার বাড়ি ফিরে যাচ্ছে, তখন সুজয় কেঁদে ভাসিয়ে দিয়েছিল।

বাবা বলছিলেন, এই তো মজা, দেখলে তো, আগে দেখনি চেননি বলে আপনজনও তোমার কাছে পর হয়ে ছিল। এখন থেকে এরা তোমার সত্যিকারের আত্মীয় হল। এবার ভেবে দেখো এত বড় দেশের কত মানুষকে তুমি জানও না, চেনও না। একবার জানলে আর চিনলে তারাও তোমার আপন হয়ে যাবে। দূরে থাকলেই পর, কাছে এলে সবাই আপন। এই তো দেখো না, কলকাতায় আমাদের পাড়ায় স্বামীনাথন বলে যে ছেলেটি থাকে, তোমার সঙ্গে রোজ খেলা করে, তার বাড়ি তো মাদ্রাজে। কিন্তু সে কি তোমার পর? তাকে জান বলেই সে তোমার আপনজন হয়েছে। তোমার এই জেঠতুতো খুড়তুতো ভাইবোনদের চাইতে সে কম আপন নয়। ও একদিন খেলতে না এলে তোমার মন খারাপ হয়ে যায়।

তা হলে ভেবে দেখো এমন কত ছেলে-মেয়েকে জান না বলেই তারা পর হয়ে আছে। বাংলারই পাশে আসামে, বিহারে, ওড়িশায়, দূরে পাঞ্জাবে, গুজরাটে, মহারাষ্ট্রে কত ছেলে-মেয়ের সঙ্গে তোমার পরিচয় হয় নি। অনেক সত্যিকারের ভাইবোন তোমার হিসেব থেকে বাদ পড়ে আছে।

অবশ্য যদি তোমার ইচ্ছা থাকে তবে এই ঘাটতি তুমি পূরণ করে নিতে পার : বড় হয়ে ভারতবর্ষের সব রাজ্য তুমি ঘুরে দেখবে। তখন বুঝবে সারা ভারতবর্ষে তোমার কত ভাইবোন, আপনজন ছড়িয়ে আছে। দেশময় মস্ত বড় একটা পরিবার। এক পরিবারের মধ্যেই কতরকমের মানুষ থাকে। তুমি খাচ্ছ ভাত, আর একজন খাচ্ছে রুটি, কেউ মাছ-মাংস, কেউ নিরামিষ।

আর ওই-যে তোমার দিদিটি, মাসিমার মেয়ে, তার পোশাকটা লক্ষ্য করেছ ? ওরা দিল্লিতে থাকে, পঞ্জাবী মেয়েদের মতো ও মাঝে মাঝে সালোয়ার কামিজ পরে। তোমার যে মামাতো ভাই কানপুরে থাকে, সে তো বাংলার চাইতে হিন্দি বলে ভালো।

এখন ভেবে দেখো, তোমার আপনজনের মধ্যে যা দেখছ, ভারতবর্ষ-জোড়া আমাদের যে বিরাট পরিবার তাতেও ঠিক তাই দেখবে, কতরকমের পোশাক, কতরকমের খাদ্য, কতরকমের ভাষা, কতরকমের ধর্ম ; কিন্তু সবাই মিলে এক পরিবার। আমরা সকলে এক পরিবারের মানুষ। আমাদের একটিমাত্র পরিচয়, আমরা ভারতবাসী।

অনুশীলনী

১। নিচের শব্দগুলোর অর্থ ও ব্যবহার শেখো :

উপলক্ষ্যে ; জন্মাবধি ; বিরাট ; আপনজন ; ঢুকে ; ঘাটতি ; পরিবার ; সমবয়সী।

২। ভারতবর্ষকে মহাদেশ বলা চলে কেন ?

৩। নিচের শব্দগুলোর অর্থের পার্থক্য শেখো :

ভাব — সকলের সঙ্গে খুব ভাব জমে গেল।

ভাব — 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার' কবিতাটির মূল ভাব কি ?

৪। ব্যাখ্যা করো : 'দূরে থাকলেই পর, কাছে এলে সবাই আপন।'

পণ্ডিতের ঘুড়ি

ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য

আমাদের ছেলেবেলায় আমাদের বাড়িতে একটি চাকর ছিল, তার নাম ছিল ফটিক। সব ব্যাপারেই অদ্ভুত অদ্ভুত ব্যাখ্যা করতে ফটিকের জুড়ি ছিল না। মনে পড়ে এক বর্ষার রাত্রে ঘরের মধ্যে সবাই চুপচাপ বসে আছি। বাইরে ভীষণ বাদল, থেকে থেকে আকাশ কাঁপিয়ে তুমুল শব্দ উঠছে, আর প্রতিবারই ঠিক তার আগে অন্ধকার চিরে বিদ্যুতের আলো হঠাৎ জ্বলে উঠেই আবার সঙ্গে সঙ্গে নিবে যাচ্ছে।

ফটিককে জিজ্ঞাসা করলাম, 'হ্যাঁরে, আলোটা অমন করছে কেন রে?'

ফটিক পরম বিজ্ঞের মতো জবাব দিল, 'ব্যাপারটা কি হচ্ছে জান, স্বর্গে দেবতাদের সঙ্গে দৈত্যদের লড়াই চলছে না? অন্ধকারে অসুবিধা হওয়ায় দৈত্যরা বারে বারে আলো জ্বালাচ্ছে, আর দেবতারা সঙ্গে সঙ্গে তা নিবিয়ে দিচ্ছেন। অন্ধকারে তো আর ভালো করে লড়াই করা যায় না!'

ফটিক এমনিতে চালাক-চতুর কিন্তু লেখাপড়া কিছু শেখে নি। ছেলেবেলা থেকে সেও ঐ রকম শুনে এসেছে। কাজেই ওর কাছে এই ধরনের ব্যাখ্যা খুব অস্বাভাবিক নয়। আর শুধু ফটিক কেন, এখনো হয়তো অজ পাড়াগাঁয়ে গেলে এমন অনেক লোক দেখা যাবে যারা বুড়ো বয়সেও এ-সব আজগুবি বিশ্বাস ছাড়তে পারে নি।

কিন্তু তোমাদের যদি জিজ্ঞাসা করি তোমরা হয়তো একসঙ্গে বলে উঠবে— 'এ আর জান না? ও হচ্ছে ইলেকট্রিক আলো— যাকে সোজা বাংলায় বলে বিদ্যুতের আলো। মেঘে মেঘে ঘষা

লেগে আকাশে ইলেকট্রিসিটি অর্থাৎ বিদ্যুৎ তৈরি হচ্ছে। আলোটা তারই, শব্দটাও। আলো শব্দের চেয়ে তাড়াতাড়ি ছোটে কিনা, তাই আলোটা আগে দেখা যাচ্ছে, শব্দটা শোনা যাচ্ছে পরে।'

আজ এ কথাটা সকলেই জোর গলায় বলতে পারে কিন্তু একদিন ছিল যেদিন বড় বড় পণ্ডিতেরাও আমাদের ঐ ফটিকের মতোই এ-সবের কিছুই জানতেন না। বিজ্ঞানী হাতেনাতে প্রমাণ ক'রে দেখিয়েছেন, তবেই না লোকে জেনেছে!

সে অনেক দিনের কথা। দু'শ বছরেরও বেশি। মানুষ তখন ঘরে বসে অল্পস্বল্প বিদ্যুৎ তৈরি করতে শিখেছে কিন্তু এখনকার মতো নানা কাজে তাকে খাটাতে শেখে নি। শুধু পণ্ডিত-মহলে জিনিসটা নিয়ে একটু সাড়া পড়েছে এই পর্যন্ত।

এই সময়ে আমেরিকার বেন্‌জামিন ফ্র্যাঙ্‌কলিন নামে একজন লোক ছিলেন। বেন্‌জামিন ছিলেন গরিবের ছেলে কিন্তু লেখা-পড়ার দিকে তাঁর ঝোঁকটা ছিল বরাবরই খুব বেশি। নিজের চেষ্টায় বড় হয়ে তিনি কালে দেশের নেতা হয়েছিলেন, দেশকে স্বাধীন করতেও তাঁর ভূমিকা বড় কম ছিল না।

কিন্তু রাজনীতির সঙ্গে সঙ্গে তিনি আরো একটা জিনিসের চর্চা করতেন — সেটা হচ্ছে বিজ্ঞান। বিশেষ ক'রে এই বিদ্যুৎ সম্বন্ধে তাঁর ছিল দারুণ কৌতূহল।

কোনো কোনো জিনিসে ঘষাঘষি করলে অনেক সময়ে বেশ খানিকটা বিদ্যুৎ তৈরি করা যায়। বিদ্যুতের পরিমাণ বেশি হলে অনেক সময়ে তা শব্দ ক'রে জ্বলে ওঠে — অনেকটা আকাশের বিদ্যুতের মতোই। কয়েকজন পণ্ডিত এই সাদৃশ্য দেখে সন্দেহ করলেন — হয়তো বর্ষার আকাশে যে আলো জ্বলে ওঠে — তার সঙ্গে এই ঘরের তৈরি বিদ্যুতের কোনো মিল আছে।

বেন্‌জামিন ফ্র্যাঙ্‌কলিনও ছিলেন এঁদের মধ্যে একজন। কিন্তু

তিনি শুধু সন্দেহ করেই ক্ষান্ত থাকতে পারেন নি, প্রায়ই ভাবতেন ব্যাপারটা সত্যি কিনা পরীক্ষা ক'রে দেখা যায় না ?

পরীক্ষা করতে হলে আকাশের বিদ্যুৎকে ধরে আনা দরকার। কিন্তু তাই বা কি ক'রে হয় ? অনেক ভেবেচিন্তে তাঁর মাথায় এক অদ্ভুত বুদ্ধি এল।

তার পর একদিন সকলে দেখে আধ-বয়সী একজন ভদ্রলোক নিতান্ত ছোট ছেলেটির মতো মনের আনন্দে ঘুড়ি ওড়াচ্ছেন। পৎ পৎ ক'রে আকাশে ঘুড়ি উঠে যাচ্ছে আর তিনিও সঙ্গে সঙ্গে দিব্যি সুতো ছেড়ে যাচ্ছেন। অনেকেই মনে করল লোকটা পাগল। ভয় পেয়ে এক বুড়ী গিয়ে থানায় খবর দিল। থানার লোকেরা এসে দেখে লোকটি আর কেউ নয় — স্বয়ং প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বেন্‌জামিন ফ্র্যাঙ্‌কলিন।

ফ্র্যাঙ্‌কলিন ঠিক করেছিলেন ঘুড়িতে ক'রে আকাশের বিদ্যুৎ ধরবেন, তাই বুড়ো বয়সে গিয়েছিলেন ঘুড়ি ওড়ানো শিখতে।

এখানে একটা কথা জানা দরকার। বিদ্যুৎ জিনিসটা সব-কিছুর ভিতর দিয়ে সমানভাবে যেতে পারে না। কোনো কোনো জিনিসের মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ বা আরো সঠিক ক'রে বললে বিদ্যুৎপ্রবাহ খুব তাড়াতাড়ি যায়, যেমন তামা, লোহা প্রভৃতি ধাতু। আবার কোনো কোনো জিনিসের মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহ যেতেই পারে না। সিল্ক বা রেশম এই ধরনের একটি জিনিস।

ফ্র্যাঙ্‌কলিন একটা সিল্কের ঘুড়ি তৈরি করলেন আর তার মাথায় একটা তামার তার বেঁধে দিলেন আর তারপর সঙ্গে জুড়ে নিলেন খুব লম্বা ঘুড়ির সুতো। ঐ সুতো কিন্তু তিনি হাত দিয়ে ধরলেন না, সুতোর গোড়ায় হাতখানেক লম্বা একটা সিল্কের ফিতে বেঁধে নিয়ে সেই ফিতেরই অপর প্রান্ত ধরে রইলেন, আর সেখানটায় সুতোর সঙ্গে সিল্কের ফিতে বাঁধা হল সেই গিঁঠটায় একটা পিতলের

চাবি বেঁধে দিলেন। এই হল তাঁর সরঞ্জাম। তার পর অপেক্ষা করতে লাগলেন কখন ঘন মেঘ এসে আকাশ ছেয়ে ফেলে।

তার পর একদিন বর্ষা এল, আকাশ মেঘে মেঘে ঢেকে ফেলল, শুরু হল বিদ্যুতের চমক। ফ্র্যাঙ্‌কলিন তাঁর ঘুড়ি নিয়ে মাঠে চলে এলেন আর ক্রমাগত সুতো ছাড়তে ছাড়তে সেই ঘুড়ি মেঘের গায়ের উপর নিয়ে ফেললেন।



প্রথমবার একটা বিদ্যুতের ঝিলিক ঘুড়ির উপর দিয়ে চলে গেল; কিছুই হল না। ফ্র্যাঙ্‌কলিনের বুকটা দুরু দুরু ক'রে উঠল। —তবে কি তাঁর সন্দেহ ভুল? একটু পরে আবার বিদ্যুৎ চমকাল। ফ্র্যাঙ্‌কলিন দেখলেন হঠাৎ তাঁর ঘুড়ির সুতো টান টান হয়ে গেল! ঘুড়ির উপর সত্যি সত্যিই বোধ হয় বিদ্যুৎ পড়েছে! সুতোর কাছে আঙুল নিয়ে ফ্র্যাঙ্‌কলিন দেখলেন, বিদ্যুৎ যেমন ক'রে টানে সুতোও যেন তেমনি ক'রে তাঁর আঙুল টানছে।

তার পর বৃষ্টি আরম্ভ হল, সুতো ভিজে গেল। ফ্র্যাঙ্‌কলিন সেই চাবিটার গায়ে হাত দিলেন। চাবির উপরটা দপ্‌ ক'রে জ্বলে

উঠল আর সঙ্গে সঙ্গে এক ঝাঁকুনি খেয়ে ফ্র্যাঙ্‌কলিন মাটিতে পড়ে গেলেন।

তোমাদের মধ্যে যাদের বাড়িতে বিজলিবাতি বা পাখা আছে তারা অনেকেই হয়তো এই বিদ্যুতের ঝাঁকুনি— যাকে ইংরেজিতে বলা হয় 'ইলেকট্রিক শক'— জিনিসটার একটু আধটু পরিচয় পেয়েছ। আচমকা ঐ রকম একটা শক খেলে তোমাদের মনে যে খুব আনন্দ হয় না এটা বোধহয় আমি হলফ ক'রে বলতে পারি।

কিন্তু এই ঝাঁকুনি খেয়ে ফ্র্যাঙ্‌কলিনের দুঃখ হওয়া দূরে থাক, যতটা আনন্দ হয়েছিল ততটা আনন্দ তোমাদের কারো জীবনে হয়েছে কিনা সন্দেহ। কেননা এই ঝাঁকুনির ফলেই প্রমাণিত হয়ে গেল — মেঘলা আকাশে যে আলো চমকায় তা আসলে বিদ্যুৎ অর্থাৎ ইলেকট্রিসিটির আলো ছাড়া কিছুই নয়।

অনুশীলনী

১। নিচের শব্দগুলোর বানান, অর্থ ও ব্যবহার শেখো :

বিজ্ঞানী, অস্বাভাবিক, বিজ্ঞ, স্বাধীন, ভূমিকা, প্রমাণ, চর্চা, কৌতূহল, সাদৃশ্য, প্রসিদ্ধ, সরঞ্জাম, আচমকা, বিদ্যুৎপ্রবাহ, ক্ষান্ত, হলফ।

২। মেঘে মেঘে ঘসা লেগে কি হয়? আলো যে শব্দের চেয়ে তাড়াতাড়ি ছোটে তার একটি দৃষ্টান্ত দাও।

৩। আকাশের বিদ্যুৎ এবং ঘরের বিদ্যুৎ একই শক্তি, বেনজামিন ফ্র্যাঙ্‌কলিন কিভাবে তা প্রমাণ করেছিলেন?

৪। ইলেকট্রিক শক খেয়ে বেন্‌জামিন ফ্র্যাঙ্‌কলিন এত খুশি হয়েছিলেন কেন?

৫। বিদ্যুৎ দিয়ে চালানো হয় এমন কয়েকটি জিনিসের নাম করো।

মার কাছে যাচ্ছি

গীতা চট্টোপাধ্যায়

নীল বেলুনের বিম্বে শৈশবের সুডোল আকাশ,
চড়ুইপাখির নাচে পুজোর সকালে ছুটিভরা ;
পৌষের পিটুলিচিত্রে দুর্বা ধান কড়ি লক্ষ্মীসরা,
নলেন গুড়ের গন্ধে বাতাসের সুষ্ঠু প্রাতরাশ।
খঞ্জনী কাঁদিয়ে যেত গোষ্ঠগানে মহাজন দাস
পাণ্ডুর মলাটে আঁকা শোকবধূ বিধুর উত্তরা ;
মহাভারতের শ্লোকে ঘুম ছুঁয়ে চলেছে ঘর্ঘরা—
লাল সিঁদুরের টিপে লাল ঠোঁটে মার অনুপ্রাস।

অনুশীলনী

১। প্রথম চার লাইন মুখস্থ লেখো।

২। শৈশবের কোন্ কোন্ চিত্র এই কবিতাংশে ফুটে উঠেছে ?

৩। অর্থ লেখো :

সুডোল, লক্ষ্মীসরা, প্রাতরাশ, গোষ্ঠগান, পাণ্ডুর, বিধুর, অনুপ্রাস।

৪। সমাস ভেঙে লেখো :

লক্ষ্মীসরা, শোকবধূ, মহাজন, পিটুলিচিত্র।

ডেঞ্চো পিঁপড়ের মন্তব্য

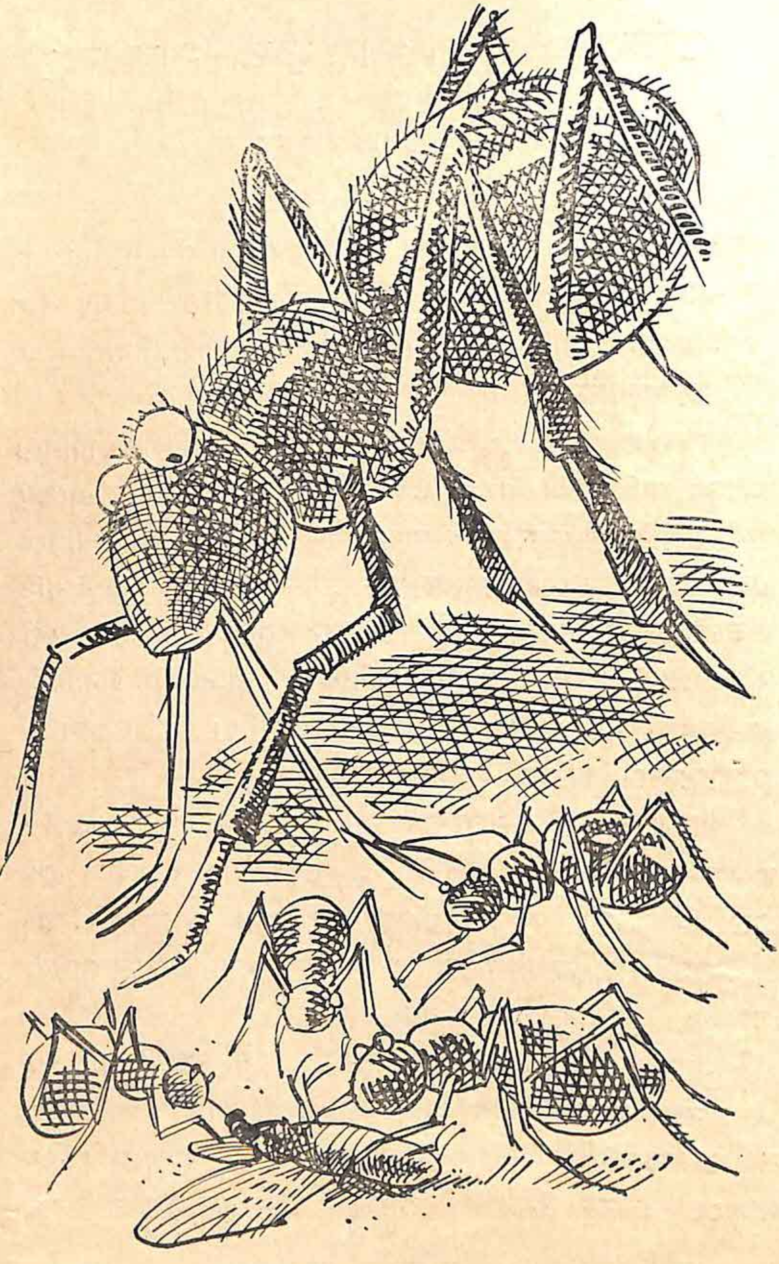
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দেখো দেখো, পিঁপড়ে দেখো! খুদে খুদে রাঙা রাঙা সরু সরু সব আনাগোনা করছে — ওরা সব পিঁপড়ে, যাকে সংস্কৃত ভাষায় বলে পিপীলিকা। আমি হচ্ছি ডেঞ্চো, সমুচ্চ ডাঁইবংশসম্ভূত, ওই পিঁপড়েগুলোকে দেখলে আমার অত্যন্ত হাসি আসে।

হা হা হা, রকম দেখো, চলছে দেখো, যেন ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে গেছে; আমি যখন দাঁড়াই তখন আমার মাথা আকাশে ঠেকে! সূর্য যদি মিছরির টুকরো হত আমার মনে হয় আমি দাঁড়া বাড়িয়ে ভেঙে ভেঙে এনে আমার বাসায় জমিয়ে রাখতে পারতুম। উঃ, আমি এত বড়ো একটা খড় এতখানি রাস্তা টেনে এনেছি, আর ওরা দেখো কী করছে — একটা মরা ফড়িং নিয়ে তিন জনে মিলে টানাটানি করছে। আমাদের মধ্যে এত ভয়ানক তফাত! সত্যি বলছি, আমার দেখতে ভারি মজা লাগে।

আমার পা দেখো আর ওদের পা দেখো! যতদূর চেয়ে দেখি আমার পায়ের আর অন্ত দেখি নে, এত বড়ো পা! পদমর্যাদা এর চেয়ে আর কী আশা করা যেতে পারে! কিন্তু পিঁপড়েরা আপনাদের খুদে খুদে পা নিয়েই সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট আছে। দেখে আশ্চর্য বোধ হয়। হাজার হোক, পিঁপড়ে কিনা।

ওরা একে ক্ষুদ্র, তাতে আবার আমি বিস্তর উঁচু থেকে দেখি — ওদের সবটা আমার নজরে আসে না। কিন্তু আমি আমার অতি দীর্ঘ ছ পায়ের উপরে দাঁড়িয়ে কটাক্ষে দৃক্‌পাত করে আন্দাজে ওদের আগাগোড়াই বুঝে নিয়েছি। কারণ, পিঁপড়ে এত ক্ষুদ্র যে ওদের



দেখে ফেলতে অধিকক্ষণ লাগে না। পিঁপড়ে-জাতি সম্বন্ধে আমি ডাঁই ভাষায় একটা কেতাব লিখব এবং বক্তৃতাও দেব।

পিঁপড়ে-সমাজ সম্বন্ধে আমার বিস্তর অনুমানলব্ধ অভিজ্ঞতা আছে। ডেঞ্চেদের সন্তানস্নেহ আছে, অতএব পিঁপড়েদের তা কখনোই থাকতে পারে না; কারণ, তারা পিঁপড়ে, কেবলমাত্র পিঁপড়ে, পিঁপড়ে ব্যতীত আর কিছুই নয়। শোনা যায় পিঁপড়েরা মাটিতে বাসা বানাতে পারে; স্পষ্টই বোধ হচ্ছে তারা ডেঞ্চে জাতির কাছ থেকে স্থপতিবিদ্যা শিক্ষা করেছে—কারণ, তারা পিঁপড়ে, সামান্য পিঁপড়ে, সংস্কৃত ভাষায় যাকে বলে পিপীলিকা।

পিঁপড়েদের দেখে আমার অত্যন্ত মায়া হয়, ওদের উপকার করবার প্রবৃত্তি আমার অত্যন্ত বলবতী হয়ে উঠে। এমনকি আমার ইচ্ছা করে, সভ্য ডেঞ্চে সমাজ কিছুদিনের জন্য ছেড়ে, দলকে-দল ডেঞ্চে ভ্রাতৃবৃন্দকে নিয়ে পিঁপড়েদের বাসার মধ্যে বাসস্থাপন করি এবং পিঁপড়ে-সংস্কারকার্যে ব্রতী হই—এতদূর পর্যন্ত ত্যাগস্বীকার করতে আমি প্রস্তুত আছি। তাদের শর্করাকণা গলাধঃকরণ করে এবং তাদের বিবরের মধ্যে হাত পা ছড়িয়ে কোনোক্রমে আমরা জীবনযাপন করতে রাজী আছি, যদি এতেও তারা কিছুমাত্র উন্নত হয়।

তারা উন্নতি চায় না—তারা নিজের শর্করা নিজে খেতে এবং নিজের বিবরে নিজে বাস করতে চায়, তার কারণ তারা পিঁপড়ে, নিতান্তই পিঁপড়ে। কিন্তু আমরা যখন ডেঞ্চে তখন আমরা তাদের উন্নতি দেবই, এবং তাদের শর্করা আমরা খাব ও তাদের বিবরে আমরা বাস করব—আমরা এবং আমাদের ভাইপো, ভাগ্নে, ভাইঝি ও শ্যালকবৃন্দ।

যদি জিজ্ঞাসা কর তাদের শর্করা আমরা কেন খাব এবং তাদের বিবরে কেন বাস করব তবে তার প্রধান কারণ এই দেখাতে পারি

যে, তারা পিঁপড়ে এবং আমরা ডেঞ্জে! দ্বিতীয়, আমরা নিঃস্বার্থভাবে পিঁপড়েদের উন্নতিসাধনে ব্রতী হয়েছি, অতএব আমরা তাদের শর্করা খাব এবং বিবরেও বাস করব। তৃতীয়, আমাদের প্রিয় ডাঁইভূমি ত্যাগ করে আসতে হবে, সেইজন্য, সেই দুঃখ নিবারণের জন্য, শর্করা কিছু অধিকা পরিমাণে খাওয়া আবশ্যক। চতুর্থ, বিদেশে বিজাতির মধ্যে বিচরণ করতে হবে, নানা রোগ হতে পারে—তা হলে বোধ করি আমরা বেশি দিন বাঁচব না—হায়, আমাদের কী শোচনীয় অবস্থা! অতএব শর্করা খেতেই হবে, এবং বিবরেও যতটা স্থান আছে সমস্ত আমরা এবং আমাদের শ্যালকেরা মিলে ভাগাভাগি করে নেব।

পিঁপড়েরা যদি আপত্তি করে তবে তাদের বলব, অকৃতজ্ঞ! যদি তারা শর্করা খেতে এবং বিবরে স্থান পেতে চায় তবে ডাঁই ভাষায় তাদের স্পষ্ট বলব, তোমরা পিঁপড়ে, ক্ষুদ্র, তোমরা পিপীলিকা। এর চেয়ে আর প্রবল যুক্তি কী আছে!

তবে পিঁপড়েরা খাবে কী? তা জানি নে। হয়তো আহার এবং বাসস্থানের অকুলান হতেও পারে, কিন্তু এটা তাদের ধৈর্য ধরে বিবেচনা করা উচিত যে, আমাদের দীর্ঘপদস্পর্শে ক্রমে তাদের পদবৃদ্ধি হবার সম্ভাবনা আছে। শৃঙ্খলা এবং শান্তির কিছুমাত্র অভাব থাকবে না। তারা ক্রমিক উন্নতি লাভ করুক এবং আমরা ক্রমিক শর্করা খাই, এমনি একটা বন্দোবস্ত থাকলে তবেই শৃঙ্খলা এবং শান্তি রক্ষা হবে, না হলে তুমুল বিবাদের আটক কী?—মাথায় গুরুভার পড়লে এতই বিবেচনা করে চলতে হয়।

শর্করাভাবে এবং অতিরিক্ত শান্তি ও শৃঙ্খলার ভয়ে যদি পিঁপড়ে জাতি মারা পড়ে? তা হলে আমরা অন্যত্র উন্নতি প্রচার করতে যাব—কারণ, আমরা ডেঞ্জে জাতি, উচ্চ পদের প্রভাবে অত্যন্ত উন্নত।

অনুশীলনী

১। সংস্কৃত নাম যার 'পিপীলিকা', তার বাংলা নাম? ক্ষুদে পিঁপড়েকে ডেঞ্জেরা কী চোখে দেখে?

২। ডেঞ্জেরা ছোট পিঁপড়েদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করার ব্যাপারে কি সব ছলছুতো দেখায়?

৩। গল্পচ্ছলে এই লেখায় কাকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে?

৪। সমার্থ লেখো :

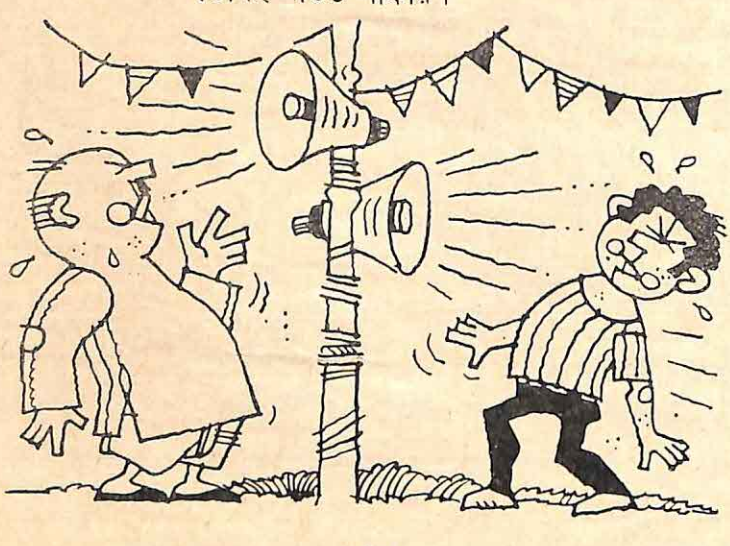
সমুচ্চ, খণ্ড, কটাক্ষে দৃকৃপাত, আন্দাজ, কেতাব, স্থপতিবিদ্যা, শর্করা, বিবর, ক্রমিক।

উচ্চ কথক

অজিত দত্ত

(১৯০৭-১৯৭৯): জন্ম—ঢাকা, বিক্রমপুর। পিতা অতুল কুমার। অধ্যাপক ছিলেন। 'কুসুমের মাস', 'পাতালকন্যা', 'নষ্টচাঁদ' কবিতাগ্রন্থ লিখেছেন।

উচ্চ কথক কণ্ঠ তোলেন
উচ্চ হতে উচ্চে,
নেই পরোয়া কেউ বা তখন
পড়ছে কেউ ঘুমুচ্ছে।
কার বা ব্যামো, পরীক্ষা কার,
নেই কিছুতে বিকার,
বাজের চেয়ে জোর গলা যার
তিনিই লাউডস্পীকার।



সুরকে ইনি অসুর করেন,
মিষ্টি করেন কটু,
ধনঞ্জয়ের মতন ইনি
কর্ণবোধে পটু।
রাগ-রাগিনী রাগিয়ে তোলেন
ধমক মারে তারা,
কোলের ছেলে চমকে কাঁদে,
পথিক দিশাহারা।

অনুশীলনী

১। উচ্চ কথকটি কে ?

২। প্রথম স্তবকটি মুখস্থ লেখো।

৩। অর্থ লেখো :

ব্যামো, বিকার, অসুর, দিশাহারা।

৪। ব্যাখ্যা করো :

ধনঞ্জয়ের মতন ইনি কর্ণবোধে পটু ; সুরকে ইনি অসুর করেন ; রাগ-রাগিণী রাগিয়ে তোলেন।

তীর নিক্ষেপ

[নাটিকা]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[পরীক্ষাভূমি। রাজা, রাজকুমারগণ, ইশা খাঁ, নিশানধারী ও ভাট]

ইন্দ্রকুমার। দাদা, আজ তোমাকে জিততেই হবে, নইলে চলবে না।

যুবরাজ। চলবে না তো কী! আমার তীরটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হলেও জগৎসংসার যেমন চলছিল ঠিক তেমনিই চলবে। আর, যদিবা নাই চলত তবু আমার জেতবার কোনো সম্ভাবনা দেখছি নে।

ইন্দ্রকুমার। দাদা, তুমি যদি হার, তবে আমি ইচ্ছাপূর্বক লক্ষ্যভ্রষ্ট হব।

যুবরাজ। না ভাই, ছেলেমানুষি কোরো না। ওস্তাদের নাম রাখতে হবে।

ইশা খাঁ। যুবরাজ, সময় হয়েছে, ধনুক গ্রহণ করো। মনোযোগ কোরো। দেখো, হাত ঠিক থাকে যেন।

[যুবরাজের তীর-নিক্ষেপ]

ইশা খাঁ। যাঃ ফসকে গেল!

যুবরাজ। মনোযোগ করেছিলুম খাঁ সাহেব, তীরযোগ করতেই পারলুম না।

ইন্দ্রকুমার। কখনো না। মন দিলে তুমি নিশ্চয় পারতে। দাদা, তুমি কেবল উদাসীন হয়ে সব জিনিস ঠেলে ফেলে দাও, এতে আমার ভারি কষ্ট হয়।

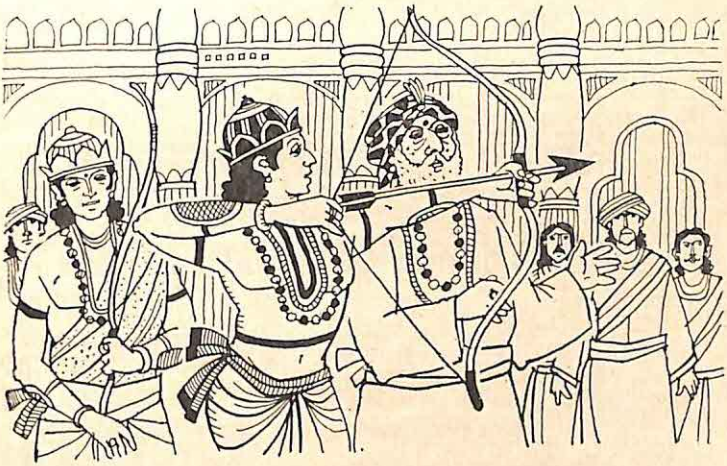
ইশা খাঁ। তোমার দাদার বুদ্ধি তীরের মুখে কেন খেলে না, তা জান? বুদ্ধিটা তেমন সূক্ষ্ম নয়।

ইন্দ্রকুমার। সেনাপতি সাহেব, তুমি অন্যায় বলছ।

ইশা খাঁ। (রাজধরের প্রতি) কুমার, এবার তুমি লক্ষ্য ভেদ করো, মহারাজ দেখুন।

রাজধর। আগে দাদার হোক।

ইশা খাঁ। এখন উত্তর করবার সময় নয়, আমার আদেশ পালন করো।



[রাজধরের তীর-নিক্ষেপ]

ইশা খাঁ। যাক্ তোমার তীরও তোমার দাদার তীরেরই অনুসরণ করেছে—লক্ষ্যের দিকে লক্ষ্যও করে নি।

যুবরাজ। ভাই, তোমার বাণ অনেকটা নিকট দিয়েই গেছে, আর একটু হলেই লক্ষ্য বিদ্ধ করতে পারত।

রাজধর। লক্ষ্য বিদ্ধ তো হয়েছে। দূর থেকে তোমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছ না। ওই-যে বিদ্ধ হয়েছে।

যুবরাজ। না রাজধর, তোমার দৃষ্টির ভ্রম হয়েছে—লক্ষ্য বিদ্ধ হয় নি।

রাজধর। আমার ধনুর্বিদ্যার প্রতি তোমাদের বিশ্বাস নেই বলেই তোমরা দেখেও দেখতে পাচ্ছ না। আচ্ছা, কাছে গেলেই প্রমাণ হবে।

[ইন্দ্রকুমারের ধনুক-গ্রহণ]

যুবরাজ। (ইন্দ্রকুমারের প্রতি) ভাই, আমি অক্ষম, সেজন্যে আমার উপর তোমার রাগ করা উচিত না। তুমি যদি লক্ষ্যভ্রষ্ট হও, তা হলে তোমার ভ্রষ্টলক্ষ্য তীর আমার হৃদয় বিদীর্ণ করবে এ তুমি নিশ্চয় জেনো।

[ইন্দ্রকুমারের তীর-নিক্ষেপ]

নেপথ্যে জনতা। জয় কুমার ইন্দ্রকুমারের জয়।

[বাদ্য বাজিয়া উঠিল। যুবরাজ ইন্দ্রকুমারকে আলিঙ্গন করিলেন]

ইশা খাঁ। পুত্র, আল্লার কৃপায় তুমি দীর্ঘজীবী হয়ে থাকো। মহারাজ, মধ্যমকুমার পুরস্কারের পাত্র। যেরূপ প্রতিশ্রুত আছেন তা পালন করুন।

রাজধর। না মহারাজ, পুরস্কার আমারই প্রাপ্য। আমারই তীর লক্ষ্যভেদ করেছে।

মহারাজ। কখনোই না।

রাজধর। সেনাপতি সাহেব, পরীক্ষা করে আসুন, কার তীর লক্ষ্যে বিঁধে আছে।

ইশা খাঁ। আচ্ছা, আমি দেখে আসি।

[প্রস্থান]

[তীর হাতে লইয়া ইশা খাঁর পুনঃপ্রবেশ]

ইশা খাঁ। (ইন্দ্রকুমারের প্রতি) বাবা, আমি বুড়োমানুষ, চোখে তো ভুল দেখছি নে। এই তীরের ফলায় যেন রাজধরের নাম দেখা যাচ্ছে।

ইন্দ্রকুমার। হাঁ, রাজধরেরই নাম।

মহারাজ। দেখি। তাই তো! একসঙ্গে আমাদের সকলেরই ভুল হল!

রাজধর। আজ নয়, মহারাজ, আমার প্রতি বরাবরই ভুল হয়ে আসছে।

ইশা খাঁ। কিছু বোঝা যাচ্ছে না।

ইন্দ্রকুমার। আমি বুঝেছি।

রাজধর। মহারাজ, আজ বিচার করুন।

ইন্দ্রকুমার। (জনান্তিকে) বিচার! তুমি বিচার চাও! তা হলে মুখে চুনকালি পড়বে! বংশের লজ্জা প্রকাশ করব না— অন্তর্যামী তোমার বিচার করবেন।

ইশা খাঁ। কী হয়েছে বাবা! এর মধ্যে একটা রহস্য আছে। শিলা কখনো জলে ভাসে না, বানরে কখনো সংগীত গায় না। বাবা ইন্দ্রকুমার, ঠিক কথা বলো তো কী হয়েছে? তূণ বদল হয় নি তো?

রাজধর। কখনোই না। পরীক্ষা করে দেখো।

ইশা খাঁ। তাই তো দেখছি—তূণ তো ঠিকই আছে। আচ্ছা বাবা ইন্দ্রকুমার, সত্য করে বলো, এর মধ্যে তোমার অস্ত্রশালায় কেউ কি প্রবেশ করেছিল?

ইন্দ্রকুমার। সে কথায় প্রয়োজন নেই, খাঁ সাহেব।

ইশা খাঁ। ঠিক করে বলো বাবা—তুমি নিশ্চয় জান কেউ তোমার অস্ত্রশালায় গিয়ে তোমার সঙ্গে তীর বদল করেছে।

ইন্দ্রকুমার। চুপ করো খাঁ সাহেব। ও কথা থাক।

ইশা খাঁ। তা হলে তুমি হার মানছ?

ইন্দ্রকুমার। হাঁ, আমি হার মানছি।

ইশা খাঁ। শাবাশ বাবা শাবাশ! তুমি রাজার ছেলে বটে! মহারাজ, কোথাও একটা কিছু অন্যায় হয়ে গেছে, সে কথাটা

প্রকাশ হচ্ছে না। আর-একবার পরীক্ষা না হলে ঠিকমত মীমাংসা হতে পারবে না।

রাজধর। খাঁ সাহেব, অন্যায় আর কিছু নয়, আমার জেতাই অন্যায় হয়েছে। কিন্তু তা বলে আবার পরীক্ষার অপমান আমি স্বীকার করতে পারব না। আমার জিত হওয়া যদি অন্যায় হয়ে থাকে সে অন্যায়ের সহজ প্রতিকার আছে। আমি পুরস্কার চাই নে, মধ্যমকুমারকেই পুরস্কার দেওয়া হোক।

মহারাজ। সে-কথা আমি বলতে পারি নে—তীরে যখন তোমার নাম লেখা আছে, তখন তোমাকে পুরস্কার দিতেই আমি বাধ্য। এই তুমি নাও।

[তলোয়ার প্রদান]

রাজধর। পুরস্কার আমি শিরোধার্য করে নিচ্ছি, কিন্তু আমার এই সৌভাগ্যে কারো মন যখন প্রসন্ন হচ্ছে না তখন এই তলোয়ার আমি দাদা ইন্দ্রকুমারকে দিলুম।

[ইন্দ্রকুমারের দিকে তলোয়ার অগ্রসর-করণ]

ইন্দ্রকুমার। (তলোয়ার মাটিতে নিক্ষেপ করিয়া) ধিক্! তোমার হাত থেকে এ পুরস্কারের অপমান গ্রহণ করবে কে?

ইশা খাঁ। (ইন্দ্রকুমারের হাত ধরিয়া) কী! ইন্দ্রকুমার, মহারাজের দত্ত তলোয়ার তুমি মাটিতে ফেলে দিতে সাহস কর! তোমার এই অপরাধের সমুচিত শাস্তি হওয়া চাই।

ইন্দ্রকুমার। (হাত ছাড়াইয়া লইয়া) বৃদ্ধ! আমাকে স্পর্শ কোরো না।

ইশা খাঁ। পুত্র, একি পুত্র! তুমি আজ আত্মবিস্মৃত হয়েছ।

ইন্দ্রকুমার। সেনাপতি সাহেব, আমাকে ক্ষমা করো। আমি যথার্থই আত্মবিস্মৃত হয়েছি। আমাকে শাস্তি দাও।

যুবরাজ। ক্ষান্ত হও ভাই, ঘরে ফিরে চলো।

ইন্দ্রকুমার। (মহারাজের পদধূলি লইয়া) পিতা, অপরাধ মার্জনা করুন। আজ সকল রকমেই আমার হার হয়েছে।

ইশা খাঁ। মহারাজ, আমার একটি নিবেদন আছে। খেলার পরীক্ষা তো চুকেছে, এবার কাজের পরীক্ষা হোক। দেখা যাবে তাতে আপনার কোন্ পুত্র পুরস্কার আনতে পারে।

মহারাজ। কোন্ কাজের কথা বলছ, সেনাপতি?

ইশা খাঁ। আরাকান-রাজের সঙ্গে মহারাজের যুদ্ধের মতলব আছে। সৈন্যও তো প্রস্তুত হয়েছে। এইবার কুমারদের সেই যুদ্ধে পাঠানো হোক।

মহারাজ। ভালো কথাই বলেছ সেনাপতি। খবর পেয়েছি, আরাকানের রাজা চট্টগ্রামের সীমানার কাছে এসেছেন। বারবার শিক্ষা দিয়েছি, কিন্তু মূর্খের শিক্ষার শেষ তো কিছুতেই হয় না, যমরাজের পাঠশালায় না পাঠালে গতি নেই। কী বল, বৎসগণ? আমাদের সেই চিরশত্রুর সঙ্গে লড়াইয়ে যাত্রা করে ক্ষাত্রচর্যে দীক্ষা গ্রহণ করতে রাজী আছ কি?

ইন্দ্রকুমার। আছি। দাদাও যাবেন।

রাজধর। আমিও যাব না মনে করছ নাকি?

মহারাজ। তবে ইশা খাঁ তুমি সৈন্যাধ্যক্ষ হয়ে এঁদের সকলকে শত্রুবিজয়ে নিয়ে যাও। ত্রিপুরেশ্বরী তোমাদের সহায় হোন।

অনুশীলনী

১। নিচের শব্দগুলোর বানান, অর্থ ও ব্যবহার শেখো:

নিক্ষেপ, ভাট, লক্ষ্যভ্রষ্ট, ওস্তাদ, ফস্‌কে, উদাসীন, লক্ষ্যবিদ্ধ, বিদীর্ণ, নেপথ্যে, আলিঙ্গন, প্রতিশ্রুতি, ফলায়, চুনকালি, অন্তর্যামী, শিলা, তূণ, অস্ত্রশালা, মীমাংসা, শিরোধার্য, সৌভাগ্য, সমুচিত, আত্মবিস্মৃত, মার্জনা, মতলব, ক্ষাত্রচর্যে, দীক্ষা, ত্রিপুরেশ্বরী।

২। সেনাপতি ইশা খাঁ কোন্ রাজকুমারকে বেশি ভালবাসতেন এবং কেন?

৩। রাজধর কি ক'রে পরীক্ষায় জয়ী হয়েছিল, তার বিবরণ দাও।

৪। ইন্দ্রকুমারের মনের কেমন পরিচয় তুমি নাটিকা থেকে পেয়েছ?

৫। বিশেষ্যকে বিশেষণে এবং বিশেষণকে বিশেষ্য পদে পরিবর্তিত করো:

প্রবেশ, উদাসীন, মনোযোগ, অপমান, নিবেদন।

নিজে পড়ি

অষ্টম পাঠ

এই অষ্টম পাঠ 'নিজে পড়ি' অষ্টম শ্রেণীর উপযোগী বাংলা পাঠ্য বই (reader)। এই বইয়ের সঙ্গে মিলিয়ে এরই পরিপূরক 'নিজে লিখি নিজে পড়ি' অষ্টম ভাগ বইটি প্রকাশিত হয়েছে, যেটি অনুশীলনী বা সহায়ক পুস্তিকা (workbook)। বই দু'খানি এমনভাবে লেখা হয়েছে যাতে মধ্যশিক্ষা স্তরের ছেলেমেয়েরা সহজে বাংলা ভাষার বিভিন্ন রচনাশৈলী আয়ত্ত করতে শেখে এবং এই ভাষায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বচ্ছ চিন্তা আর সুষ্ঠু ভাব প্রকাশে উৎসাহ পায়।

এই পুস্তকমালার লেখিকা একজন অভিজ্ঞ শিক্ষিকা এবং তিনি এই স্তরের আরো অনেক শিক্ষক-শিক্ষিকার অভিজ্ঞতা মিলিয়ে এর পরিকল্পনা করেছেন। তার ফলে এই পুস্তকগুলি হয়ে উঠেছে বাংলা শেখার অন্যতম প্রধান ও সর্বাধুনিক পুস্তকমালা।

প্রথম শ্রেণীর আগের স্তরে, অর্থাৎ প্রস্তুতি শ্রেণীর (Preparatory) জন্য কেবল 'নিজে লিখি নিজে পড়ি' [প্রাথমিকা]-সহ এই পুস্তকমালায় প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রতি শ্রেণীর জন্য দুখানি ক'রে (পাঠ্য ও অনুশীলনী) পুস্তক পরিকল্পিত হয়েছে। আকার ও আয়তন পৃথক হলেও প্রতিটি পুস্তক পরস্পরের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য ধারাবাহিক ও ক্রমাগ্রসর (graded) পদ্ধতিতে ও নিয়ন্ত্রিত শব্দসমষ্টি (controlled vocabulary) বজায় রেখে এগুলি রচিত হয়েছে।

বাংলা যাদের দ্বিতীয় ভাষা এবং বাংলা যাদের প্রথম বা মাতৃভাষা—উভয় শ্রেণীর ছেলেমেয়েরাই—মধ্যশিক্ষা স্তরে বাংলা ভাষা শিক্ষায় একই যোগসূত্রে মিলতে পারবে এই পুস্তকমালায়। কারণ এতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব স্কুল সারটিফিকেট একজামিনেশন্স্ নির্ধারিত বাংলা পাঠক্রম সযত্নে অনুসরণ করা হয়েছে।

Bandyopadhyay, Gita: NIJE PARI [Bengali, Reader
ISBN O 86131 720 3
R
1990
1990
Rs 15.50